সংবাদ প্রত্রের সংবাদের ভিত্তিতে

অভিবাসী শ্রমিকের অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৯

প্রতিবেদন প্রস্তুত: মামুন অর রশিদ, তথ্য কর্মকর্তা, বিল্‌স

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: বিল্‌স তথ্য বিভাগ

বিল্‌স-অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প

সহযোগিতায়: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-২০, রোড়-১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫; ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০

ইমেইল: bils@citech.net; ওয়েবসাইট: www.bilsbd.org

জীবন-জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র ছুটে চলছে মানুষ। স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের খোঁজে সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে একসময় পৌঁছায় অন্য কোনও দেশে। এতে করে উপকৃত হয় দু'দেশই। দেশান্তরী ব্যক্তির নিজ দেশ; আর যে দেশে তিনি অভিবাসী হচ্ছেন সেটিও। একদিকে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ পাঠিয়ে চাঙ্গা রাখেন নিজ দেশের অর্থনীতি। তার পাঠানো রেমিটেন্সে লাভবান হয় তার স্বদেশ। অন্যদিকে গন্তব্য দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ছাড়াও নিজের শ্রম, মেধা আর কাজ দিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করেন ভিনদেশের অর্থনীতি। এভাবে তারা হয়ে ওঠেন দুই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নেপথ্য কারিগর।

যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে জনশক্তি রপ্তানি। আর এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশ যেখানে সীমিত সম্পদ এবং সীমাহীন চাহিদার কারণে জনসংখ্যাকে উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেখানে এই বিশাল জনসংখ্যার একটা অংশকে বাইরে রপ্তানি করতে পারলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বস্তি ফিরে আসবে; অন্যদিকে এক ধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যোগ হতে পারে ইতিবাচক ভাবমূর্তি। তবে এই জনসংখ্যাকে রপ্তানি করার আগে এদের জনশক্তিতে রূপান্তর করা জরুরি।

কোনও কোনও দেশের শ্রমবাজারের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছেন অভিবাসী শ্রমিকরা। কাজের অভাবে অনেক সময় বাধ্য হয়েই নিজ দেশের সীমানা ছাড়েন অভিবাসীরা। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের অন্যতম শ্রমিক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ স্বীকৃত। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৩টি দেশে বাংলাদেশের এক কোটির অধিক মানুষ অভিবাসী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। অভিবাসী কর্মীরা দেশের গর্ব। বিপুল সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। বিদেশে দক্ষ, আধাদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ কেবল জাতীয় আয়কেই সমৃদ্ধ করেনি, ব্যক্তি ও পরিবারের সার্বিক উন্নতিতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনীতির চালিকাশক্তি।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্থনীতিতে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উন্নয়ন সূচকে বিশ্বব্যাপী ঈর্ষণীয় অবস্থান প্রশংসিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে কয়টি ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে তার একটি হলো রেমিট্যান্স বা প্রবাসীদের আয়। বর্তমানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগুচ্ছে বাংলাদেশ; এটা এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। আর এই সমৃদ্ধির অর্থনীতি গড়তে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করছে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখো প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্স। তারাও উন্নয়নের সমান অংশীদার।

কর্মসংস্থান:

বর্তমানে বিশ্বের ষষ্ঠ শ্রমিক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে বিশ্বে অভিবাসী শ্রমিকদের উৎস দেশের তালিকায় শীর্ষে আছে ভারত। এরপর যথাক্রমে মেক্সিকো, চীন, রাশিয়া, সিরিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। বিশ্বের প্রায় ১৭৩টি দেশে এক কোটি বিশ লক্ষের কিছু বেশী বাংলাদেশী শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি প্রবাসী শ্রমিক রয়েছেন সৌদি আরবে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৮ লাখ ৮৪ হাজার বাংলাদেশী পাড়ি জমিয়েছেন। এরপর রয়েছে আরব আমিরাত, সেখানে ২৩ লাখ ৭০ হাজার শ্রমিক পাড়ি জমিয়েছেন।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে ৭ লাখ ১ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক কাজের জন্য বিদেশ গমন করেছে। এদের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১ লাখ ১১ হাজার। তারমধ্যে দক্ষকর্মী ছিল ৪৪ শতাংশ, আধা দক্ষ ছিল ২০ শতাংশ।

২০১৯ সালে জেলাভিত্তিক সবচেয়ে বেশি বিদেশ গমন করেছে কুমিল্লা থেকে (৬৬,৩৩৫), এরপর রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৪১,৪৫৫), চট্টগ্রাম (৩৪, ৮৮৭), টাঙ্গাইল (৩৪,০৭৬) ও ঢাকা (২৮,০৫১) এলাকার লোকজন। এছাড়া মানিকগঞ্জ থেকে ১৪ হাজার ৭৫৫ জন শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আর দেশের হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩ লাখ ৯৯ হাজার শ্রমিক গমন করেছে সৌদি আরবে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ওমান, সেখানে ৭২ হাজার ৬৫৪ জন শ্রমিক পাড়ি জমিয়েছেন। এরপর যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে কাতার (৫০ হাজার ২৯২ জন) এবং সিঙ্গাপুর (৪৯ হাজার ৮২৯ জন)।

সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণের রেকর্ড:

বর্তমানে রেমিট্যান্স আহরণে বিশ্বের ১১ তম অবস্থানে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে রেকর্ড পরিমাণ ১ হাজার ৮৩৩ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সেরও রেকর্ডও এটি। বাংলাদেশি টাকায় এর পরিমাণ ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৬৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এর আগে ২০১৮ সালে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫৫৩ কোটি ৭৮ লাখ মার্কিন ডলার। ২০১৯ সালের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ২০১৮ সালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি।

২০১৯ সালের প্রথম থেকেই বাড়তে থাকে রেমিট্যান্স প্রবাহ। ওই বছরের জানুয়ারি মাসে রেমিট্যান্স আসে ১৫৯ দশমিক ৭২ কোটি মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারিতে ১৩১ দশমিক ৭৭, মার্চে ১৪৫ দশমিক ৮৬ ও এপ্রিলে ১৪৩ দশমিক ৪৩ কোটি মার্কিন ডলার। এরপর মে মাসে আবার রেকর্ড পরিমাণ ১৭৪ দশমিক ৮১ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আসে, জুনে ১৩৬ দশমিক ৮২ কোটি মাকির্ন ডলার, জুলাইয়ে ১৫৯ দশমিক ৭৬ কোটি মার্কিন ডলার, আগস্টে ১৪৪ দশমিক ৪৭ কোটি মার্কিন ডলার, সেপ্টেম্বরে ১৪৭ দশমিক ৬৯ কোটি মার্কিন ডলার, অক্টোবরে ১৬৩ দশমিক ৯৬ কোটি মার্কিন ডলার, নভেম্বরে ১৫৫ দশমিক ৫২ কোটি মার্কিন ডলার ও সর্বশেষ ডিসেম্বর মাসে ১৬৮ দশমিক ৭০ কোটি মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আসে। বছর শেষে রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৮৩২ কোটি ৫১ লাখ মার্কিন ডলার। ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে রেমিট্যান্স আসে ১ হাজার ৫৫৩ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। ২০১৭ সালে ১ হাজার ৩৫৩ কোটি ডলার, ২০১৬ সালে ১ হাজার ৩৬১ কোটি ডলার ও ২০১৫ সালে ১ হাজার ৫৩১ কোটি ডলার।

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর শীর্ষ ১০টি দেশ হলো যথাক্রমে সৌদি আরব, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ওমান, যুক্তরাজ্য, কাতার, ইতালি ও বাহরাইন।

শ্রম বাজার পরিস্থিতি:

১৯৭৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চিত্র বলছে, বাংলাদেশের শ্রমবাজারের ৮০ শতাংশের বেশি মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর মিলিয়ে ১৫ শতাংশের মতো। অবশিষ্ট বাজার নানা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। জনশক্তি রপ্তানি গত এক দশকে ৯৭টি দেশ থেকে বেড়ে শ্রমবাজার ১৬৮টি দেশে ছড়িয়েছে। তবে অধিকাংশ দেশেই কর্মী যাচ্ছে হাতে গোনা। শ্রমবাজার নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগছে বাংলাদেশ। জনশক্তি রপ্তানিতে ভাটার টান চলছে কয়েক বছর ধরে। সত্যিকার অর্থে নতুন শ্রমবাজার তৈরি হচ্ছে না। স্বল্প আয়তনের বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন ১৭ কোটির কাছাকাছি। এ বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সত্যিকার অর্থেই দুরূহ। এ ক্ষেত্রে আশার আলো হয়ে জ্বলছিল মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারগুলো। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা এবং সেসব দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য শ্রমবাজারগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ছে। দৃশ্যত রেমিট্যান্স আয় না কমলেও জনশক্তি রপ্তানি কমে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছে। যুদ্ধবিগ্রহের কারণে সৌদি আরবে এমনিতেই শ্রমিক নেওয়ার পরিমাণ কমেছে। সেখানে এখন বাংলাদেশি নারী কর্মীদের বিষয়ে আগ্রহ দেখানো হচ্ছে। বাংলাদেশের অন্য শ্রমবাজার আরব আমিরাত দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। এ ছাড়া সেখানে অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠার তেমন কোনো উদ্যোগও দৃশ্যমান নয়। ইদানীং মালয়েশিয়া দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার হয়ে উঠেছিল। সেখানে সরকার পরিবর্তনের পর বন্ধ করে রেখেছে শ্রমিক নেওয়া। সরকার দফায় দফায় বৈঠক করেও সুরাহা করতে পারছে না।

বড় শ্রমবাজারগুলো বন্ধ থাকার পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের বিষয়েও তেমন কোনো উদ্যোগ কার্যকর হয়নি। শ্রমবাজারের এসব সংকটের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের নির্যাতিত-নিপীড়িত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কর্মীরা প্রায়ই অবৈধ হয়ে পড়ছেন। ট্যুরিস্ট বা ভিজিট ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসায় বাংলাদেশিদের বিদেশে গিয়ে অবস্থানের ঘটনাও বাড়ছে। ফলে অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশিদের আইনগত ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেক দেশ বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করছে। বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের স্বার্থেই শ্রমবাজারগুলো টিকিয়ে রাখা এবং নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অর্থনীতি সচল রাখার জন্য রেমিট্যান্স আয়ের প্রবাহ অটুট রাখা দরকার। এ উদ্দেশ্যে সরকারকে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনগুলোকে শ্রমবাজার সচল রাখা ও নতুন বাজারের অন্বেষণে সক্রিয় করতে হবে।

সংকুচিত হচ্ছে পুরোনো শ্রমবাজার:

জ্বালানি তেলের দরপতনে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। তারপর থেকেই বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার সৌদি আরবে জনশক্তি রপ্তানিতে ভাটা শুরু হয়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ বেকারত্ব কমাতে ১২ ধরনের কাজে কোনো বিদেশি না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। এসব কাজে যুক্ত পুরোনো প্রবাসীরাও দেশে ফিরে আসছেন। সরকারের পক্ষ থেকে আরব আমিরাতের বাজার খুলে যাওয়ার দাবি করা হলেও বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না। পুরুষ শ্রমিকদের বাজার সেখানে কার্যত বন্ধ। তবে দুই দেশের সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী, ধীরে ধীরে ১৯টি পেশায় পুরুষ কর্মী নেওয়ার কথা রয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসের উদ্যোগের ঘাটতিতেই নতুন শ্রমবাজার উন্মুক্ত হচ্ছে না। কয়েক যুগের পুরনো নীতিতে চলছে এ খাত। রপ্তানিকারকরা যেসব দেশের চাহিদাপত্র আনতে পারেন, শুধু সেখানেই বাংলাদেশ কর্মী পাঠাতে পারে। বাংলাদেশি কর্মীদের প্রায় ৯৫ শতাংশ এমন সব দেশে যান যেগুলোতে শ্রম আইন দুর্বল ও বিদেশি শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন সাধারণ ঘটনা। দক্ষতার ঘাটতি থাকায় পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশে বাংলাদেশ কর্মী পাঠাতে পারে না।

মালয়েশিয়ার দুয়ার খুলেও খুলছে না, কালো তালিকায় ৩০ হাজার বাংলাদেশী:

শ্রম রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত কোম্পানিগুলো সিন্ডিকেট করে ভয়াবহ অনিয়মে জড়িত এমন অভিযোগে বন্ধ বড় শ্রমবাজার মালয়েশিয়ার দুয়ার। দীর্ঘতন ধরে সেখানে শ্রমিক রপ্তানি বন্ধ। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে নতুন করে আর ভিসা দেয়নি মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়ায় সরকার পরিবর্তনের পর আগের কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি (মাত্র ১০ অ্যাজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানো) বাতিল করে সে দেশের সরকার। উল্টো শ্রমিকদের ফেরত পাঠাচ্ছে মালয়েশিয়া।

এদিকে মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থান করা প্রবাসী শ্রমিকদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় নিজ দেশে ফেরার সুযোগ করে দিতে 'ব্যাক ফর গুড' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে দেশটির অভিবাসন কর্তৃপক্ষ। সাধারণ ক্ষমার আওতায় মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন প্রায় ৪২ হাজার বাংলাদেশী। এর মধ্যে ডিসেম্বরের আগে ফেরার অনুমতি পেয়েছেন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক। তাদের প্রত্যেককেই এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কালো তালিকাভুক্ত করে ১০ আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গার প্রিন্ট) নিয়েছে মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষ। ফলে কালো তালিকার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ থাকছে না তাদের। তবে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ইস্যু করা স্পেশাল পাসগুলোয় কালো তালিকাভুক্তির সিল দেয়া হচ্ছে না।

মালয়েশিয়া থেকে অবৈধ শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে ১৪ ডিসেম্বর থেকে কুয়ালালামপুর-ঢাকা রুটে ১৬টি অতিরিক্ত ফ্লাইট দিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। একই সঙ্গে এ ১৬টি ফ্লাইটে বাংলাদেশ সরকার টিকিট প্রতি ১২ হাজার টাকা করে ভর্তুকি দিয়েছে।

সৌদি আরব থেকে ফেরত আসছে শ্রমিক:

অভ্যন্তরীণ বেকারত্ব কমাতে ১২ ধরনের কাজে কোনো বিদেশি নেবে না সৌদি আরব। এসব কাজে যুক্ত পুরনো প্রবাসীরাও দেশে ফিরে আসছেন। এ জন্য সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সৌদি আরব থেকে বিপুলসংখ্যায় দেশে ফিরে আসছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা। সবমিলিয়ে ২০১৯ সালে ফেরত এসেছেন ১৮ হাজার শ্রমিক। এর মধ্যে ১ হাজারেরও বেশি নারী শ্রমিক। যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

শ্রমিক ফেরত আসার অন্যতম কারণ সৌদি 'ফ্রি ভিসা', আর সৌদি আরবের নতুন শ্রমনীতি এবং অর্থনীতির নতুন বাস্তবতা। এছাড়া নারী শ্রমিকদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন। ফ্রি ভিসায় কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের আকামা ফি বাড়িয়ে দেওয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈধদেরও ফেরত পাঠাচ্ছে সৌদি আরব:

চার লাখ টাকা খরচ করে সৌদি আরবে যান কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর যুবক মো: রুবেল। পাঁচ মাসের মাথায় আরও ১১৯ বাংলাদেশি কর্মীর সঙ্গে খালি হাতে দেশে ফেরেন তিনি। রুবেলের আকামা ও ভিসার মেয়াদসহ প্রয়োজনীয় সব বৈধ কাগজ থাকার পরও সৌদি পুলিশ তাকে আটক করে দেশে ফেরত পাঠায়। তার মতো অন্তত ১২ হাজার বাংলাদেশিকে চলতি বছরে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে সৌদি আরব, যাদের অধিকাংশেরই ছিল বৈধ কাগজ।
সৌদি সরকারের অভিযোগ, তারা চাকরি না করে রাস্তায় হকারের কাজ করছে, সবজি বিক্রি করছে। সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। তবে কর্মীরা বলছেন, তারা চুক্তি মেনেই চাকরি করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরব থেকে ফেরা বাংলাদেশি কর্মীদের প্রায় সবার গল্প একই রকম। আকামার মেয়াদ থাকার পরও পুলিশ ধরে ফেরত পাঠিয়েছে।

সৌদি ফেরত কর্মী ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের এ তেলসমৃদ্ধ দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। সৌদিতে বিদেশি কর্মীদের কাজের সুযোগ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে গাড়ির বিক্রয়কর্মী, তৈরি পোশাক ও আসবাবপত্র এবং বাড়ির সরঞ্জামের দোকানসহ ১১টি খাতে বিদেশি কর্মী নিয়োগ নিষিদ্ধ করে সৌদি আরব। দক্ষ কর্মী না থাকায় পেশাভিত্তিক কাজগুলোতে বাংলাদেশিরা নিয়োগ পায় না। কম বেতনের 'অড জব' করেন তারা। তবে ইদানীং অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সৌদির নাগরিকরা এ ক্ষেত্রেও কাজ খুঁজে নিচ্ছেন।

ঝুঁকিতে আমিরাতের শ্রমবাজার:

বাংলাদেশে অন্যতম রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে দীর্ঘ সাত বছর। পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে দেশটিতে অভ্যন্তরীণভাবে মালিক পরিবর্তনের সুযোগ। ভিসা জটিলতা খুলবে, খুলছে করেও খোলেনি। বৈধ পথে এখন শ্রমিক ভিসা নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছর এ পর্যন্ত আমিরাতে গিয়েছেন দুই হাজার ১৬২ জন বাংলাদেশি। আর দেশটি থেকে চলতি বছর বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানো হয় প্রায় ১৮০ কোটি ডলারের বেশি।
আমিরাতে ভ্রমণ ভিসার প্রক্রিয়া শিথিল থাকার সুযোগ নিচ্ছেন বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণ। স্বভাবতই এই ভিসায় কাজের অনুমতি থাকে না। এক মাস বা তিন মাসের নির্ধারিত সময়ের জন্য দেওয়া হয় এ ভিসা। মেয়াদ শেষ হলে আরও দু'বার পাওয়া যায় নবায়নের সুযোগ। কিন্তু সেই সময় শেষে অবস্থান করলে গুনতে হবে প্রায় এক লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা। মূলত একটি ভিজিট ভিসার পেছনে খরচ হয় মাত্র ১৫-১৬ হাজার টাকা। এই সুযোগকে পুঁজি করে ফায়দা লুটছে এক শ্রেণির দালালচক্র। বাংলাদেশিদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তারা।

দালালচক্র বিভিন্নভাবে প্রতারণার ফাঁদ খুলে বসেছে। অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভ্রমণ ভিসা দিয়ে কাজ ও আকামা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিসহ লোভনীয় প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ফাঁদে পা দিয়ে আমিরাতে পাড়ি দিচ্ছে তরুণ-যুবকরা। তাদের কিছু সংখ্যক পরে তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করে দেশটিতে বিনিয়োগকারীর ভিসা নিয়ে থেকে গেলেও একটি বড় অংশই ভ্রমণ ভিসার মেয়াদ শেষ হলে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে।

দেশটিতে অবস্থানরত প্রবাসীরা বলছেন, ভ্রমণ ভিসায় এসে কাজ পাওয়া কঠিন। তাছাড়া অবৈধ বাংলাদেশিদের সংখ্যা বাড়লে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে আমিরাতে অবস্থানরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেশটির প্রশাসন যে কোনো সময় কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

হুরুব আতঙ্কে সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশীরা:

ব্যাপক মাত্রায় সৌদীকরণের ফলে সৌদি আরবে এমনিতেই ঝুঁকিতে রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থান। প্রতিদিন চাকরি হারাচ্ছেন কেউ না কেউ। এ সুযোগে ন্যায্য পাওনা না দেয়াসহ নানাভাবে কর্মীদের বঞ্চিত করছেন নিয়োগকর্তা। এ বঞ্চনা থেকে রক্ষা পেতে কর্মস্থল পরিবর্তনের সুযোগও নেই তাদের। কোনো শ্রমিক কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেই তাকে 'হুরুব' বা পলাতক ঘোষণা করছেন নিয়োগকর্তা। এরপর অবৈধ হওয়ার ফলে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন ওই শ্রমিক।

সৌদি আরব থেকে শ্রমিকদের ফিরে আসার সবচেয়ে বড় কারণ তথাকথিত ফ্রি ভিসার নামে সেখানে গিয়ে অবৈধ হয়ে পড়া। একজন শ্রমিক ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা খরচ করে সৌদি আরবে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পান, যে প্রতিষ্ঠানের চাকরি নিয়ে গেছেন, সেই বেতনে অভিবাসন খরচ উঠছে না। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকে কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে ফেলেন। পরবর্তী সময়ে নিয়োগকর্তা ওই কর্মীকে হুরুব ঘোষণা করে দিচ্ছেন।

সৌদি আরবের আইন অনুযায়ী, কোনো কর্মী ছুটি না নিয়ে কোথাও চলে গেলে নিয়োগকর্তা তাকে হুরুব বলে রিপোর্ট করেন। নিয়োগকর্তা এ রিপোর্ট ইমিগ্রেশন অফিসে গিয়ে করতে পারেন, আবার অনলাইনেও হুরুব ঘোষণা করতে পারেন। হুরুব ঘোষণা করার ২০ দিনের মধ্যে যদি ওই কর্মী কাজে ফিরে আসেন, তাহলে নিয়োগকর্তা হুরুব উঠিয়ে নিতে পারেন। আর ২০ দিনের মধ্যে না ফিরলে ওই কর্মী সৌদি আরবে অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হন এবং জোরপূর্বক দেশে ফিরতে বাধ্য হন।

সম্প্রতি সৌদি আরব থেকে ফেরত আসা কর্মীদের অনেকেই বলছেন, বৈধ ইকামা থাকা সত্ত্বেও তাদের জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হচ্ছে। তারা মূলত ফিরতে বাধ্য হয়েছেন নিয়োগকর্তা কর্তৃক হুরুব ঘোষিত হওয়ার কারণে।

নতুন সম্ভাবনা জাপান ও থাইল্যান্ডের শ্রম বাজার:

নতুন সম্ভাবনাময় বাজার হতে যাচ্ছে জাপান। বিএমইটি সূত্র জানায়, ২০১৮ জাপানে গেছেন ১৬৩ জন। ২০১৯ সালের প্রথম তিন মাসে গেছেন ৪০ জন। তবে ইতিমধ্যেই জাপান যেতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। ২৬টি স্থানে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। চলমান এ প্রক্রিয়ায় কয়েক মাসের মধ্যেই জাপানে জনশক্তি রপ্তানি বাড়তে পারে।

থাইল্যান্ডে বেকারত্বের হার বর্তমানে দশমিক ৮ শতাংশ। ফলে সেখানে বাইরের লোকের কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নার্সের সহকারী, গৃহশ্রমিক, নির্মাণকাজ ও মাছ ধরার ট্রলারে শ্রমিকের চাহিদা আছে। এই সংখ্যা প্রায় তিন লাখ হতে পারে বলে মনে করছেন এ খাতের ব্যবসায়ীরা। থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বিমান ভাড়াসহ তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। এর আগেও একবার থাইল্যান্ডের বাজার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দুই সরকারের মধ্যে চুক্তির প্রস্তাব দিলে বিষয়টি থেমে যায়।

বিভিন্ন খাতে দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে জাপানের সাথে সহযোগিতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ। জাপানের বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাপানের জাতীয় পরিকল্পনা এজেন্সির সাথে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই সহযোগিতা স্মারক সই হয়।

২৭ আগস্ট জাপানের রাজধানী টোকিওতে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব রৌনক জাহান এবং জাপানের বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় অধীন ইমিগ্রেশন সার্ভিস এজেন্সির কমিশনার মিজ সোকো সাসাকি নিজ নিজ দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে জাপানে দক্ষ কর্মী প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা দুই দেশের জন্যই লাভজনক হবে। দুইটি ক্যাটাগরিতে আগামী পাঁচ বছর কেয়ার ওয়ার্কার, বিল্ডিং ক্লিনিং ম্যানেজম্যান্ট, মেশিন পার্টস ইন্ডাস্ট্রিজ, ইলেকট্রিক, ইলেক্ট্রনিক্স, কন্সট্রাকশন, জাহাজ শিল্প, অটোমোবাইল, কৃষিসহ জাপানের ১৪টি খাতে বিশেষভাবে দক্ষ এবং জাপানিজ ভাষায় পারদর্শী কর্মীদের নিয়োগ প্রদান করবে জাপান। প্রথম ক্যাটাগরিতে জাপানীজ ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও নির্দিষ্ট কাজে দক্ষতা থাকলে পরিবার ছাড়া জাপানে পাঁচ বছর পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পাবেন। আর দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে যাদের জাপানী ভাষা ও নির্দিষ্ট কাজে দক্ষতা প্রথম ক্যাটাগরির কর্মী থেকে বেশি তারা পরিবারসহ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করার সুযোগ পাবেন।

ইতোমধ্যে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সারা দেশে ২৬টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে জাপানী ভাষায় ৪ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও জাপানি ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উভয় পক্ষ এ সময় কর্মী প্রশিক্ষণ ও নিয়োগে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

এই সহযোগিতা স্মারক সইয়ের মাধ্যমে নবম সোর্স কান্টি হিসেবে বাংলাদেশ তালিকাভুক্ত হলো। এখন থেকে অন্য দেশগুলির মতো বাংলাদেশও কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবে।

ইউরোপের চার দেশ বাংলাদেশের শ্রমশক্তি নিতে আগ্রহী, সিশেলসের সাথে চুক্তি সই:

বাংলাদেশের শ্রম শক্তি নেয়ার ব্যাপারে রোমানিয়া, পোল্যান্ড, কম্বডিয়া, ভিয়েতনাম, ক্রোরেশিয়া এবং হাঙ্গেরিসহ আরও কয়েকটি দেশ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া জনশক্তি রপ্তানির নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে দ্বীপরাষ্ট্র 'সিসিলিস'-এ। দেশটিতে জনশক্তি পাঠানোর বিষয়ে 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন লেবার কো-অপারেশন বিটুইন দ্য গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব সিসিলিস অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' চুক্তির খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

বিনা খরচে গিয়ে সিশেলসে ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন আগ্রহী বাংলাদেশী কর্মীরা। মাসে বেতন হবে ৪০ হাজার টাকার মত। সরকারী ব্যবস্থাপনায় কর্মী পাঠানো হবে। বেসরকারী রিক্রুটিং এজন্সীর মাধ্যমে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই দেশটিতে। ১০-১৫ হাজার কর্মী পাঠানো যাবে দেশটিতে।

সিশেলস এ বর্তমানে প্রায় দুই হাজার ৫০০ বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত রয়েছেন। এই দেশে নির্মাণ শিল্পে অধিকাংশ কর্মী কাজ করে থাকেন। এছাড়া হোটেল, ট্যুরিজম, স্বাস্থ্যসেবা হাউসকিপিং, কুক, ভিলা এটেন্ডেন্ট, কৃষি খামার, পোল্টি খামার, প্রভৃতি খাতেও বাংলাদেশি কর্মীরা কর্মরত আছেন। তাছাড়া ফিশিং ও ফিশ ইন্ডাস্ট্রিজ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ট্যুরিজম খাতে বাংলাদেশি কর্মীদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

লেবাননে বৈধ হচ্ছেন ৪০ হাজার বাংলাদেশি:

লেবাননে প্রায় ৪০ হাজার অবৈধ বাংলাদেশির উদ্বেগ, আতঙ্ক ও কষ্টের দিন শেষ হচ্ছে। শিগগিরই বৈধতা পাচ্ছেন এসব বাংলাদেশি শ্রমিক। ফলে বিপুল অঙ্কের টাকা জরিমানা দিয়ে তাদের আর দেশে ফিরতে হবে না। এমনকি অবৈধ হিসেবে ধরপাকড়ের শিকারও হতে হবে না। স্বাভাবিক জীবনযাপন ও কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারবেন তারা। এ

লক্ষ্যে লেবানন পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করার উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার। বৈরুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় লেবানন সরকার শুধু বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য ২০ বছরের মধ্যে প্রথম এ উদ্যোগ নিয়েছে।

লেবাননে যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই তাদের বছরপ্রতি ২৭০ ডলার করে জরিমানা দিয়ে দেশে ফিরতে হয়। দালালের ফাঁদে পড়ে অনেকে চার/পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে লেবানন গেছেন। গিয়ে কাঙ্খিত কাজ না পেয়ে, বার বার প্রতারিত হয়ে অবৈধ হয়ে পড়েছেন। পাঁচ বছর অবৈধ থাকলে তাকে ১৩৫০ ডলার জরিমানা এবং বিমান ভাড়া দিয়ে দেশে ফিরতে হয়।

সৌদি আরবে গৃহকর্মী গমন কমেছে ৩০%:

বাংলাদেশ থেকে নারী কর্মীদের সৌদি আরব গমন বড় পরিসরে শুরু হয় ২০১৪ সালে। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে দেশটিতে গেলেও মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাদের অনেককেই। এমন পরিস্থিতিতে সৌদি আরবে গমন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন বাংলাদেশী নারী কর্মীরা। সৌদি আরবের গণমাধ্যম আল-মাদিনার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এরই মধ্যে সৌদি আরবে বাংলাদেশী নারী কর্মীর গমন ৩০ শতাংশ কমেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে প্রচুরসংখ্যক বাংলাদেশী নারী-পুরুষ কাজ করতে যান। তাদের মধ্যে ১৫ লাখ নারী-পুরুষ কাজ করেন গৃহকর্মী হিসেবে। দেশটির অনেক পরিবারই বাংলাদেশী গৃহকর্মীদের কাজে নিতে পছন্দ করে।

গৃহকর্মী হিসেবে বাংলাদেশীদের নিয়োগ দেয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণও তুলে ধরা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। এর মধ্যে প্রধান কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশীদের অতি সহজে এবং কম খরচে গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নিতে পারেন সৌদি নাগরিকরা। মাত্র ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ রিয়াল খরচ করে একজন বাংলাদেশী গৃহকর্মীকে কাজে নিতে পারেন তারা। তবে সম্প্রতি দালালরা চুক্তির জন্য টাকার পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, যাকে সৌদি আরবে বাংলাদেশী নারী কর্মী গমন কমে যাওয়ার একটি কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে। এছাড়া অযোগ্যতা ও অদক্ষতা, প্রশিক্ষণ না থাকা, শৃঙ্খলাবোধের অভাবসহ আরো বেশকিছু বিষয়কে বাংলাদেশী নারী কর্মী ফেরত পাঠানোর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এতে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে গৃহকর্মী নিয়োগের সময় দুই দেশের দালালরাই খরচ বৃদ্ধি করে। সেই সঙ্গে ওই দালালরাই অযোগ্য গৃহকর্মী পাঠিয়ে দেয় সৌদিতে। যার কারণে কাজ করতে আসা বাংলাদেশী নাগরিকরা নানা সমস্যায় পড়েন। এমনকি দেশেও ফিরে যেতে বলা হয় তাদের।

হুমকির মুখে কাতারে জনশক্তি রপ্তানি:

কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। ২০২২ বিশ্বকাপ ফুটবল সামনে রেখে এখানে জনশক্তি রপ্তানি আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সৌদি আরব ও আমিরাতের পরই হচ্ছে কাতারের অবস্থান। কাতারে বসবাসরত অন্যান্য প্রবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যার বিচারে ভারতীয়দের পর দ্বিতীয় অবস্থানে থাকলেও স্বাগতিক দেশে বাংলাদেশ কমিউনিটি তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উপরন্তু কিছু বাংলাদেশি বিভিন্ন অপরাধমূলক ও বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়ায় কাতারে বাংলাদেশ কমিউনিটির ভাবমূর্তিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ফলে কাতার পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া নজরদারিতে রয়েছে বাংলাদেশ কমিউনিটি। কাজের

চুক্তিপত্র, বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে মানুষ প্রবাসে পাড়ি দিচ্ছে। এভাবে খুব সহজেই ভিসা ব্যবসায়ীদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছে অনেক প্রবাসী। অসাধু ব্যবসায়ীরা কোম্পানি খুলে মোটা টাকার বিনিময়ে কাজের কথা বলে শত শত কর্মী নিয়ে আসছে কাতারে। দেখা যাচ্ছে, কাতারে আসার পর তাদের জন্য কোনো কাজ নেই। দীর্ঘদিন কাজের সন্ধান না পেয়ে চরম হতাশায় কিংবা অর্থোপার্জনের জন্য বেপরোয়া হয়ে আইনবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ছে অনেকে।

কোম্পানির আড়ালে ভিসা বেচাকেনা করে অর্থ কামিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা কখনো হয়ে যায় লাপাত্তা। স্থানীয় কফিল বা স্পন্সরদের ভিসাপ্রতি কিছু অর্থ দিয়ে এ ধরনের অবৈধ কাজে সহযোগিতা করার জন্য প্রলোভিত করছে কিছু বাংলাদেশি ভিসা ব্যবসায়ী। দোহা শহরের বহু এলাকার ফুটপাথ, রেস্তোরাঁ ও মসজিদসংলগ্ন এলাকায় প্রচুর বাংলাদেশি নগরিককে কাজের সন্ধানে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের সমাবেশ কাতার কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করে। তাই এ ধরনের জটলা থেকে বহু মানুষকে গাড়িতে তুলে নিয়ে জেলে ভরা হচ্ছে কিংবা সরাসরি দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বাড়তি বিমান ভাড়ায় ব্যাহত মধ্যপ্রাচ্য যাত্রা:

অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব) সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিমান ভাড়া বেড়ে গেছে দ্বিগুণের বেশি। ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার ভাড়া ৬০ হাজার টাকা হয়ে গেছে। ভিসা পেয়েও অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য অনেক শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে যেতে পারছেন না।

বাড়তি বিমান ভাড়ার বিষয়টি সমাধান করতে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এতে আকাশপথের ভাড়া নিয়োগকর্তার বহন করার নির্দেশনা আছে। বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং শ্রম শাখাগুলোতে তা পাঠানোও হয়েছে। কিন্তু এখনো তার কোনো ফল আসেনি।

শ্রমবাজারে মন্দার প্রভাব অর্থনীতিতে:

দেশে প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ নতুন করে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু যোগ্য হলেও সবাই কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। সরকারি হিসাবে, প্রতিবছর কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে ১২ লাখ মানুষের। অর্থাৎ, প্রতিবছর ৮ লাখ করে বেকার বাড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আনুমানিক ১ কোটির অধীক বাংলাদেশী কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। এর মধ্যে যে হারে মানুষ দেশে ফিরে আসছেন, তারা নতুন করে দেশের শ্রমবাজারে চাপ ফেলবেন। বেকারত্ব বাড়বে। এতে মানুষের আয় কমে যাবে, আয় বৈষম্য বেড়ে যাবে। আয় কমে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট দারিদ্র অর্থনীতির পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলাতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সর্বোচ্চ খরচ করে সর্বনিম্ন বেতন পাচ্ছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা:

বিদেশ যেতে অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি খরচ গুনতে হয় বাংলাদেশি শ্রমিকদের। বেতন কাঠামোতেও বাংলাদেশী শ্রমিকদের অবস্থান সবার নিচে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব মতে, বিদেশ যেতে পৃথিবীতে বাংলাদেশি শ্রমিকদেরই সবচেয়ে বেশি টাকা গুণতে হয়। ব্যাংকটির বিবেচনায়, অভিবাসনের সর্বোচ্চ ব্যয় ধরা আছে মাত্র ২০০ ডলার। তবে তথ্য বলছে, ভারতীয় শ্রমিকদের বিদেশ যেতে খরচ হয় গড়ে এক লাখ ৮০ থেকে দুই লাখ টাকা।

নেপালের ক্ষেত্রে যেটা একলাখেরও নিচে। আর ফিলিপাইন সরকারতো ঘোষণাই দিয়েছে অভিবাসন ব্যয় শূন্যের কোটায় নিয়ে আসার। অথচ বিপরীত চিত্র বাংলাদেশের। এখানে একজন শ্রমিকের বাইরে যেতে সর্বোচ্চ সাড়ে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত গুণতে হচ্ছে।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সর্বোচ্চ খরচ করে সর্বনিম্ন বেতন পাচ্ছে বাংলাদেশি শ্রমিকরা। গণহারে অদক্ষ শ্রমিক বাইরে পাঠানোর ফলে এই বৈষম্য বাড়ছে। সূত্র মতে প্রতি বছর প্রায় সাত থেকে আট লাখ মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন। যাদের বেশিরভাগ আবার না জেনে ফ্রি ভিসায় যান। কেউ কেউ কোম্পানির ভিসায় গেলেও কাজ না জেনে অদক্ষ হয়ে যাওয়ার কারণে ভোগান্তিতে পড়ছেন পদে পদে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বছরে গড়ে রেমিট্যান্স এসেছে ১৩০০ থেকে ১৬০০ কোটি ডলার। অথচ বাংলাদেশের চেয়ে পাঁচ লাখ কর্মী কম পাঠিয়েও ভারত রেমিট্যান্স পেয়েছে বাংলাদেশের প্রায় চারগুণ। নেপাল বাংলাদেশের চারভাগের একভাগ লোক বাইরে পাঠিয়ে উপার্জন করছে ৯ বিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশের অর্ধেক লোক পাঠিয়ে বাংলাদেশের দ্বিগুণ রেমিট্যান্স আয় করে ফিলিপাইন।

এখন বছরে গড়ে ছয়-সাত লাখ লোক ১৬৮টি দেশে যান। তাঁদের একটি নগণ্য অংশকে সরকার নির্দিষ্ট কিছু বাজারে পাঠায়। প্রায় সবাই আসলে যান বেসরকারি রপ্তানিকারক তথা রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে। মধ্যে আবার দালালেরা আছেন। এজেন্সি-দালাল মিলে নির্ধারিত ব্যয়ের অনেক বেশি টাকা আদায় করে নিচ্ছে।

বেসরকারি খাতে দেশ-নির্বিশেষে বাংলাদেশের গড় অভিবাসন ব্যয় ৩ লাখ টাকার ওপরে। এ খরচ ভারত, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ এবং পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর তুলনায় সাত গুণ বেশি।

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সূত্র ধরে খরচের এ হিসাব দিয়েছে জাতিসংঘের অংশী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) বাংলাদেশ কার্যালয়। তাদের হিসাবে, কুয়েত যেতে শ্রীলঙ্কার একজন অভিবাসী ব্যক্তির গড়ে ২৭ হাজার টাকার মতো লাগে। ভারতে লাগে লাখ খানেক টাকা। আর বাংলাদেশে লাগে আড়াই লাখ টাকার বেশি। যদিও সরকার-নির্ধারিত খরচ ১ লাখ টাকার সামান্য বেশি।

এদিকে বাংলাদেশি অভিবাসীরা গড়ে মাসে ১৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করেন। তাতে খরচ একেবারেই পোষায় না। জাতিসংঘ-ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুসারে, কর্মীর অভিবাসন ব্যয় তাঁর বার্ষিক মোট আয়ের ১০ শতাংশের বেশি হবে না। অর্থাৎ কেউ যদি মাসে ২৫ হাজার টাকা হিসাবে বছরে ৩ লাখ টাকা আয় করেন, তাঁর অভিবাসন ব্যয় ৩০ হাজার টাকার মধ্যে থাকতে হবে। কুয়েতে যেতে সরকার-নির্ধারিত খরচই এর পাঁচ গুণ। আদতে খরচ হয় ১০ গুণের বেশি।

বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিদেশ যাওয়ার সরকার নির্ধারিত খরচ এবং প্রকৃত খরচের চিত্র

দেশের নাম	নির্ধারিত সীমা	প্রকৃত খরচ
সৌদি আরব	১,৬৫,০০০	৫,২১,০০০
সিঙ্গাপুর	২,৬২,০০০	৪,৯৪,০০০
মালয়েশিয়া	৯৮,০০০	৩,৮০,০০০
ইউএই	১,০৮,০০০	১,৭৪,০০০
কুয়েত	১,০৭, ০০০	৩,৯৮,০০০
ওমান	১,০০,০০০	২,৬৫,০০০
কাতার	১,০০,০০০	৩,৬৬,০০০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যংকের জরিপ

তবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ব্যয় কমানোর জন্য অনলাইনভিত্তিক একটি সমন্বিত কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। কানাডার একটি কোম্পানি সফটওয়্যার তৈরি করছে। এ সফটওয়্যারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি ধাপের আর্থিক লেনদেনসহ সব ধরনের তথ্য থাকবে।

সিন্ডিকেটের কারনে বাড়ছে অভিবাসন ব্যায়ঃ

দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির এই সন্তুষ্টিরও বড়ো অবদান রয়েছে তাদের। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে তারা কি ভালো আছে? কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠালেও তাদের অবস্থা এমন যে, নানামুখী সংকটে তারা আজ নিমর্জিত। প্রতারণা, জালিয়াতদের খপ্পর থেকে শুরু করে দেশে ফেরত আসার মতো অবস্থা হয়েছে তাদের। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে। মালয়েশিয়া তো একটি কর্মসূচিই চালু করেছে অবৈধ বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠাতে। বিভিন্ন দেশের জেলহাজতেও রয়েছে অনেক প্রবাসী। যারা নানাভাবে প্রতারণার শিকার।

অসাধু জনশক্তি রপ্তানিকারক সিন্ডিকেটের কারণে অভিবাসন ব্যয় যেমন বাড়ছে, তেমনি বিদেশে গিয়েও প্রতারিত হচ্ছেন তারা। শুধু তাই নয়, জীবন নিয়েও শঙ্কিত অনেকে। নিরাপত্তাহীনতায় মানবেতর দিন কাটাতে হচ্ছে তাদের। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, মালদ্বীপসহ ইউরোপের অনেক দেশের প্রবাসীরা কষ্টে দিন যাপন করছেন। এসব দেশে বন্দি হয়ে আছেন অনেক শ্রমিক। আবার অনেকেই জুলুম-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দালাল ও এজেন্সিগুলোর 'দুষ্টচক্র' না ভাঙলে অভিবাসন ব্যয় কমানো যাবেনা। এজেন্সিগুলোর মতো মধ্যস্বত্বভোগীদেরও নিবন্ধিত করা যেতে পারে। তারপর নজরদারি বাড়ানো দরকার যাতে নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কেউ এ কাজে যুক্ত হতে না পারে। এ খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দালাল-এজেন্টদের দৌরাত্ম্য আর অতিরিক্ত খরচ। এমন কথা বলেছেন একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, এমনকি খোদ অভিবাসন খাতের একাধিক ব্যবসায়ী। এর উল্টো পিঠেই আছে বেআইনি অভিবাসনের চাপ।

জায়গাজমি বেচে সর্বস্বান্ত হয়ে যে কর্মজীবীরা বিদেশে যান, তাঁদের দক্ষতা কম, ভাষা জানেন না। আর্থিক বা সামাজিক সুরক্ষা থাকে না। নারীর থাকে নির্যাতনের ঝুঁকি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা ব্যক্তিদের পুনর্বাসন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক থাকে সৌদি আরবে। সম্প্রতি সেখানে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। কাজের অনুমতিপত্র (আকামা) থাকলেও শ্রমিকদের দেশে ফেরত আসতে বাধ্য করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সৌদি আরবে দিন দিন কাজের জায়গা কমে আসছে। ভিসা জটিলতার কারণেও অনেককে ভিন্ন কাজ করতে হচ্ছে।

সৌদি আরবের বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে প্রতিটি জায়গায় সৌদি নাগরিকদের নিয়োগকরণ বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ফলে কমে যাচ্ছে প্রবাসীদের চাহিদা। কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে যাচ্ছেন অনেক প্রবাসী। এসব শ্রমিকের আকামা নবায়ন, লেবার (শ্রম) ফি, কফিলের (নিয়োগকর্তা) মাসিক টাকা, নিজের আনুষঙ্গিক খরচ জোগাড় করতে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে। সৌদিতে ফ্রি-ভিসায় যাওয়া লোকজন এই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বেশি। সব জায়গায় সৌদি নাগরিকদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যবসার ওপরও নানান শর্ত দেওয়া হচ্ছে। ফলে অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

দালালদের পাশাপাশি বিভিন্ন দূতাবাস, কনস্যুলেট, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতার কারণেও শ্রমিকরা প্রতারিত হয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া অন্যতম। সেখানেও অবৈধভাবে বসবাসকারীদের ধরপাকড় চলছে। আর অবৈধ হয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্টদের কারণেই। ভিসার মেয়াদ বাড়ানো কিংবা অন্য যে কোনো সহযোগিতায় কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ধরনা দিতে হয়। হাইকমিশনে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত

দুর্ব্যবহার, দালালচক্রের মাধ্যমে ঘুষের লেনদেন এখানে ওপেন-সিক্রেট বলে প্রায়ই অভিযোগ আসে। হাইকমিশনে থেকে যথাযথ দায়িত্ব পালন না করায় অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রমিকদের উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেয় দালালচক্র। একপর্যায়ে বৈধরাও অবৈধ হয়ে যায়।

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের বিমা বাধ্যতামূলক:

বিদেশগামী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য বীমা পলিসি কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক এ বীমা পলিসি উদ্বোধন করেন।

বিদেশগামী এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সুরক্ষায় দু'ধরনের বীমা পরিকল্প চালু করে গত ২৫ নভেম্বর পরিপত্র জারি করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এর আগে গত ১৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা জারি করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)। নীতিমালা অনুসারে প্রবাসী কর্মীদের জীবন বীমা সুবিধা দিতে বলা হয়। প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালা অনুসারে, বিদেশগামী কর্মীদের এই বীমা পরিকল্পে যেকোন বয়সের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম হার অভিন্ন রাখা হয়েছে। তবে কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা ও আর্থিক সামর্থ বিবেচনায় নিয়ে ৫ লাখ টাকা ও ২ লাখ টাকা বীমা অংকের দু'টি বীমা পরিকল্প চালু করা হয়েছে।

বীমা গ্রহণের বয়স ১৮ থেকে ৫৮ বছর। আর বীমার মেয়াদ ২ বছর। তবে ২ বছর বিদেশে অবস্থানকালে নিজ অর্থায়নে আরো ২ বছরের জন্য বীমা পলিসি নবায়ন করা যাবে। বিদেশগামী সকল কর্মীর জন্য ২ লাখ টাকার বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর ৫ লাখ টাকা বীমা অংকের পলিসি গ্রহণ ঐচ্ছিক।

পরিকল্প-১ তথা ২ লাখ টাকা বীমা অংকের পলিসির জন্য প্রিমিয়াম দিতে হবে ৯৯০ টাকা। আর পরিকল্প-২ তথা ৫ লাখ টাকা বীমা অংকের পলিসির জন্য প্রিমিয়াম ২ হাজার ৪৭৫ টাকা। উভয় পরিকল্পের ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহিবল থেকে কর্মী প্রতি সর্বোচ্চ ৫শ' টাকা দেয়া হবে। বাকী অর্থ কর্মীকে বহন করতে হবে।

বীমার সুবিধা হিসেবে পলিসির মেয়াদের মধ্যে যেকোন কারণে বীমা গ্রাহক মৃত্যুবরণ করলে বীমাকারী ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সাথে চুক্তিতে উল্লিখিত বীমা গ্রহীতার বৈধ উত্তরাধিকারীকে বীমা অংকের ১০০ শতাংশ পরিশোধ করা হবে বলে প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও সম্পূর্ণ অক্ষমতা বা পিডিএবি'র সুবিধা হিসেবে দুর্ঘটনায় আঘাতের ফলে ৯০ দিনের মধ্যে মৃত্যুসহ অন্যান্য ক্ষতি হলে নির্ধারিত বীমা অংক প্রদান করা হবে। এই সুবিধার জন্য বাৎসরিক প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়েছে হাজারে সাড়ে ৩ টাকা। অর্থাৎ দু'বছর মেয়াদী ৫ লাখ টাকা বীমা অংকের পলিসির জন্য প্রিমিয়াম দিতে হবে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।

তবে বীমা কভারেজ শুরুর ১২ মাসের মধ্যে আত্মহত্যা করলে, এইডস বা এইচআইভি'তে মৃত্যু হলে, উচ্চ ঝুঁকি যেমন মটর রেসিং, পেশাগত বক্সিং, স্কুবা ডাইভিং, হ্যান্ড গ্লিডিং, প্যারাস্যুটিং, ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা, পর্বতারোহন ইত্যাদির কারণে মৃত্যু হলে বীমা গ্রহীতা কোন বীমা অংকের অর্থ পাবে না।

এ ছাড়াও বীমা কভারেজ শুরুর পূর্ব থেকে বিদ্যমান শর্তাদীতে উল্লেখিত কারণ, অ্যালকোহল বা মাদকের কারণে মৃত্যু, যুদ্ধ, দাঙ্গা, বেসামরিক আন্দোলন বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে মৃত্যু এবং গুরুতর অপরাধের কারণে আইনে মৃত্যুদন্ড হলেও বীমা গ্রহীতা কোন বীমা অংকের অর্থ পাবে না।

প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা, ২ শতাংশ নগদ সহায়তা:

প্রবাসী আয়ে ২ শতাংশ নগদ সহায়তা দিতে নীতিমালা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে এখন থেকে যারা আয় পাঠাবেন, তাঁদের সুবিধাভোগীরা ২ শতাংশ বেশি টাকা পাবেন।
বাংলাদেশ ব্যাংক এ নীতিমালা জারি করে কার্যকর করার জন্য ব্যাংকগুলোর কাছে পাঠিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা দিতে বিলম্ব বা হয়রানি করা হলে ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, গত ১ জুলাই থেকে যারা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন, তাঁরাও সরকারের ২ শতাংশ নগদ সহায়তা সুবিধা পাবেন। আর ১ হাজার ৫০০ ডলারের কম আয় এলে কোনো নথিপত্র ছাড়াই প্রণোদনা পাওয়া যাবে। এ সুবিধা দিতে ব্যাংকগুলোকে অগ্রিম তিন মাসের প্রণোদনার অর্থ দেবে সরকার।

বাজেটে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে প্রবাসীরা ১০০ টাকা দেশে পাঠালে ২ টাকা প্রণোদনা পাবেন। বাজেটে এ জন্য ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

নীতিমালা অনুযায়ী, যেসব ব্যাংকে প্রবাসী আয় আসবে, তারাই সুবিধাভোগীকে ২ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেবে। প্রতি বার ১ হাজার ৫০০ ডলারের আয় এলে তাৎক্ষণিক সুবিধা দিতে হবে। এর বেশি আয় এলে পাসপোর্টের কপি, বিদেশি কোম্পানির নিয়োগপত্র, ব্যবসার নথিপত্র জমা দিলে নগদ সহায়তা মিলবে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ দিনের মধ্যে প্রণোদনা দিতে হবে। গ্রাহককে আয় আসার তথ্য জানানোর সময় নগদ সহায়তার তথ্য আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো গ্রাহক নিয়ম ভেঙে নগদ সহায়তা নিলে তা ফেরত দিতে হবে বলেও জানানো হয়েছে নীতিমালায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যে হিসাব রয়েছে, তা থেকে ওই টাকা কেটে রাখবে ব্যাংকগুলো। এ কাজে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তাদের শাস্তিও দেওয়া হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যাংকগুলো পরবর্তী তিন মাসের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের প্রণোদনার তহবিল নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আগের বছরের চেয়ে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে চাহিদা দিতে হবে। এ তহবিল শেষ হলেও ব্যাংকগুলোকে নিজ তহবিল থেকে প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ব্যাংকগুলোকে প্রতিটি প্রণোদনার তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। এতে প্রবাসী আয় প্রেরকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট, গ্রহণকারী নাম ও পেশা, ব্যাংকের নামসহ আরও নানা তথ্য জমা দিতে হবে।

১১ বছরে সবচেয়ে বেশি প্রবাসীর লাশ এসেছে ২০১৯ সালে:

১৯৭৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকারি হিসাবে বাংলাদেশ থেকে এক কোটি ২৮ লাখ তিন হাজার ১৮৪ জন চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছেন। তবে বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর মধ্যে প্রতি মাসেই ফিরে আসছেন বহু শ্রমিক। বিদেশে যাওয়া

শ্রমিকদের তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ডাটাবেইসে উল্লেখ থাকলেও ফেরত আসা শ্রমিকদের কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। একই সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই দেশে আসছে প্রবাসে মারা যাওয়া কর্মীদের লাশ। বিএমইটি সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ বছরে সবচেয়ে বেশি লাশ এসেছে ২০১৯ সালে। সরকারী হিসেবে তিন হাজার ৬৫৮ প্রবাসী কর্মীর মরদেহ দেশে আসে। এর মধ্যে রয়েছে ১২৯ নারী কর্মীর লাশ।

অভিবাসী শ্রমিকদের লাশ আসার চিত্র	
সাল	সংখ্যা
২০১৯	৩,৬৫৮
২০১৮	৩,০৫৭
২০১৭	২,৯১৯
২০১৬	২,৯৮৫
২০১৫	২,৮৩১
২০১৪	২,৮৭২
২০১৩	২,৫৪২
২০১২	২,৩৮৩
২০১১	২,২৩৫
২০১০	২,২৯৯
২০০৯	২,৩১৫

অতিরিক্ত কাজের চাপ, মানসিক চাপ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাসহ নানা কারণে লাশ হয়ে দেশে ফিরছেন প্রবাসীরা। অনেক টাকা খরচ করে বিদেশে যাওয়ার পর ঋণের টাকা পরিশোধের চাপ, প্রতিদিন ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা বিরামহীন পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, দীর্ঘদিন স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাসহ নানা কারণে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। চূড়ান্ত অবস্থায় মৃত্যুর কারণ হিসেবে জানা যায়, বেশির ভাগ প্রবাসী মারা যান হার্ট অ্যাটাকে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসীকল্যাণ ডেস্ক সূত্রে জানা যায়, ২০০৯ সালে ২৩১৫ জন, ২০১০ সালে ২২৯৯ জন, ২০১১ সালে ২২৩৫ জন, ২০১২ সালে ২৩৮৩ জন, ২০১৩ সালে দুই হাজার ৫৪২ জন, ২০১৪ সালে দুই হাজার ৮৭২ জন, ২০১৫ সালে দুই হাজার ৮৩১ জন, ২০১৬ সালে দুই হাজার ৯৮৫ জন, ২০১৭ সালে দুই হাজার ৯১৯ জন এবং ২০১৮ সালে তিন হাজার ৫৭ জনের মরদেহ দেশে আসে। অর্থাৎ গত ১১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবাসীর লাশ দেশে এসেছে এ বছর। ২০১৮ সালের চেয়ে ২০১৯ সালে প্রায় আট শতাধিক প্রবাসীর লাশ বেশি এসেছে দেশে।

প্রবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর নেপথ্যে:

প্রতি বছর প্রায় ৪ লাখেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমাচ্ছে প্রবাসে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেই প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রায় দেড় হাজার কোটি ডলার দেশে পাঠিয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৈদেশিক আয়ের এই খাতের (রেমিট্যান্স) অবদান প্রায় ১২ শতাংশ। তবে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের মায়া ত্যাগ করে, আত্মীয়স্বজনদের ভালোবাসা বিসর্জন দিয়ে এ বিশাল অবদান রেখে যাচ্ছে তাদের লাশ আসছে প্রতিনিয়ত।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের হিসেব অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ জন শ্রমিকের লাশ আসছে। ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে এসেছে ২ হাজার ৬১১টি লাশ। এর মধ্যে প্রথম ছয় মাসের মৃত্যুর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ৬২ শতাংশই মারা গেছেন স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে। এরপর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন প্রায় ১৮ শতাংশ। আর স্বাভাবিক মৃত্যু পাঁচ শতাংশ।'

অভিবাসন খাত-সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি বিশেষজ্ঞরা উচ্চ অভিবাসন ব্যয়কে প্রবাসীদের মানসিক চাপ বাড়ানোর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন। ঋণ নিয়ে বিদেশে গিয়ে টাকা শোধ করার চাপের কারণে অতিরিক্ত কাজ করার প্রবণতা রয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করার কারণে নিয়মিত ঘুমানোর সুযোগ পান না শ্রমিকেরা। এসব কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

যাচাই হয় না মৃত্যুর কারণ:

সিলেটের হবিগঞ্জের মারুফ সরকার সৌদি আরব গিয়েছিলেন ২০১৪ সালে। চার বছর পর মারুফের মৃত্যুর খবর ফোনে হবিগঞ্জে তার পরিবারকে জানিয়েছিলেন তার একজন রুমমেট। এক মাস পরে তার লাশ দেশে আসে। লাশের সাথে আসা রিপোর্টে লেখা ছিল স্বাভাবিক মৃত্যু, কিন্তু দাফন করার সময় পরিবারের সদস্যরা মারুফের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন। স্থানীয়ভাবে এ নিয়ে আলোচনা হবার পর যাদের মাধ্যমে মারুফ বিদেশে গেছেন, তারা পরামর্শ দেয় বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা না করে মেনে নিতে।

মারুফের মত এরকম প্রবাসী শ্রমিকের লাশ দেশে ফেরার সংখ্যা বাড়ছে । সরকারি হিসাবে গত এক দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করতে যাওয়া ২৭ হাজার ৬৬২জন শ্রমিকের লাশ দেশে ফেরত এসেছে। ২০১৯ সালে প্রতিদিন গড়ে ১০ জনের বেশি প্রবাসী শ্রমিকের লাশ দেশে ফিরে এসেছে। বেশির ভাগ মৃত্যুর কারণ দেখানো হয়েছে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং স্বাভাবিক মৃত্যু বলে। মালয়েশিয়াতে ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রায় ৪০০ বাংলাদেশি শ্রমিক মারা গেছেন। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে দেখা গেছে, বেশির ভাগ শ্রমিক হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক করে মারা গেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যে তীব্র গরম, তাতে প্রচণ্ড পানি শূন্যতা তৈরি হয়। সে অবস্থায় পানি বেশি পানের পাশাপাশি আরো কী করতে হবে সেটা বুঝতে না পেরে অসুস্থ হয়ে যান অনেকে। সে অবস্থায় কাজ করতে থাকলে হয় সে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে, নতুবা কাজে মন দিতে পারবে না। উভয় ক্ষেত্রেই শারীরিক ক্ষতির সঙ্গে মানসিক চাপ বাড়ে। আর অভিবাসন ব্যয় অনেক বেশি হবার কারণে শ্রমিকেরা বিদেশ গিয়ে একটা মানসিক চাপের মধ্যে পড়েন। হয়তো ঋণ নিয়ে বিদেশে গেছেন, কিন্তু কাজটি হয়তো খুবই অল্প বেতনের। তখন দ্বিতীয় একটি কাজ বা পার্টটাইম কাজ খোঁজে তারা। ফলে অনেকেই ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে পর্যাপ্ত ঘুমানোরও সুযোগ পান না, এতে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

সেই সঙ্গে বৈধভাবে কাজের নিশ্চয়তা, দেশ থেকে যাবার সময় যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা তুলে আনার তাগিদ এবং আত্মীয়-পরিজনহীন থাকার পরিবেশ, এসব কিছু মিলিয়ে তাদের স্ট্রেস বা মানসিক সমস্যা অনেক বেশি থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের শ্রমিকেরা বেশিরভাগ দেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে অদক্ষ বা স্বল্প দক্ষতা নিয়ে যাবার কারণে নিম্ন মজুরীর কাজ করতে বাধ্য হয়। যে কারণে সেই রোজগারের মধ্যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকেনা বা তারা নিজেরাও সে খরচ করতে চায় না। যে কারণে দেখা যায়, হঠাৎ স্ট্রোক হলো বা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য মতে যেসব প্রবাসীর লাশ দেশে ফেরত আসে, তাদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে লাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে আসা ডেথ রিপোর্টে যা উল্লেখ থাকে, সেটিই জানা যায়। সেই হিসাবে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক,স্বাভাবিক মৃত্যু, এবং আত্মহত্যার কথা বেশি উল্লেখ থাকে। এর বাইরে কর্মস্থলে দুর্ঘটনা, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিদগ্ধ হওয়া এবং অসুস্থতার কারণও উল্লেখ থাকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে। এই হিসাব কেবল যেসব লাশ দেশে ফেরত আসে সেই সংখ্যা ধরে। এর বাইরে অনেক লাশ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফন করা হয়, যার হিসাব সব সময় হালনাগাদ থাকে না।

লাশের গায়ে ডেথ সার্টিফিকেটে যা লেখা থাকে, তাই সবাই জানে এবং মেনে নেয়। কিন্তু বাংলাদেশেও যদি সেটি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার ব্যবস্থা থাকত তাহলে স্বজনদের মনে কোন সন্দেহ থাকতো না। শ্রমিকদের কাজের নিরাপদ পরিবেশ, তাদের স্বাস্থ্য এবং মৃত্যুর কারণ দেশে যাচাই না করলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে না।

অভিবাসন খাত নিয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী কর্মীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু তদন্তে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর কোনো উদ্যোগ নেই। তাঁদের কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও নেই কোনো নজরদারি। বছরের পর বছর অস্বাভাবিক মৃত্যু বাড়তে থাকলেও তা প্রতিরোধে সরকার সক্রিয় হচ্ছে না বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দায়সারাভাবে পরিবারকে মৃত্যুর কারণ বলে দেওয়াটা খুব অসম্মানজনক। মৃত্যুর কারণ অবশ্যই সরকারিভাবে যাচাই করা এবং তা প্রতিরোধে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১ হাজার ৭৩৭টি মৃত্যুর তথ্য পর্যালোচনা করেছে প্রথম আলো। এতে দেখা গেছে, ৬২ শতাংশ প্রবাসী মারা গেছেন স্ট্রোকে। স্বাভাবিক মৃত্যু পাওয়া গেছে ৫ শতাংশ প্রবাসীর। প্রবাসীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশ তদন্ত করে মৃত্যুসনদ দিয়ে থাকে।

এদিকে ২০১৬ সাল থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে আসা ৩১১ নারীর লাশের তথ্য পর্যালোচনা করেছে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। তাতে দেখা গেছে, আত্মহত্যা করেছেন ৫৩ নারী। ১২০ জনের স্ট্রোক ও ৫৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে দুর্ঘটনায়। অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করা একাধিক সংস্থা বলছে, নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে বাধ্য হয়েই আত্মহত্যা করেন নারী শ্রমিকেরা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যার পর আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য বের হচ্ছে না।

অভিবাসন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রতিরোধে সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করাটা জরুরি।

প্রবাসীদের লাশেও বাণিজ্য:

দেশের লাখ লাখ কর্মী বিদেশে চাকরি করছেন। অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে তাদের মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। অনেকে এসব ঘটনায় মারা যান। কিন্তু নানা বিড়ম্বনায় দেশে তাদের লাশ আসে না। স্বজনরা দিনের পর দিন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে ঘুরে নিজ খরচেও লাশ আনতে পারছেন না। ফলে মাসের পর মাস লাশ সংশ্লিষ্ট দেশেই পড়ে থাকছে। বৈধ কর্মী হলে লাশ আনা বাবদ সরকারের পক্ষ থেকে ৩০ হাজার টাকা দেওয়ার বিধান রয়েছে। সেই টাকা পেতেও নানা কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। লাশ দেশে আনার পর সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ ৩ লাখ টাকা পরিবারকে দেওয়ার আইন রয়েছে। অভিযোগ আছে, এই টাকা পেতেও নানা টালবাহানার শিকার হতে হয় স্বজনদের। ক্ষতিপূরণের টাকা পেতেও স্বজনদের টাকা গুনতে হয়। টাকা না দিলে ক্ষতিপূরণের টাকা মেলে না। শুধু তাই নয়, স্বজনদের লাশ ফেরত এনে মন্ত্রণালয় থেকে ৩ লাখ টাকা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে একটি চক্র।

এই প্রতারক চক্র প্রবাসীদের লাশ নিয়ে বাণিজ্য করছে। প্রবাসীদের লাশ বাণিজ্যের একটি চক্র এখন সক্রিয়। এরা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নং গেটে এসে প্রবাসী শ্রমিকদের লাশ আসার খবর সংগ্রহ করে থাকে। এরপর লাশের তালিকা ও ঠিকানা নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে। তারা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৩ লাখ টাকা পাইয়ে দেওয়ার কাজে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেয়। আর এ জন্য মোটা অঙ্কের খরচ দাবি করে। প্রবাসীদের স্বজনরা ৩ লাখ টাকা পাওয়ার জন্য এদের কথা মতো ৫০ হাজার বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক লাখ টাকাও দিয়ে থাকে। টাকাগুলো নিয়েই প্রতারক চক্রের সদস্যরা গাঢাকা দেয়। এভাবে একটি চক্র বিদেশে নিহত কর্মীদের স্বজনদের কাছ থেকে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। পথে বসে যাচ্ছে স্বজনরা।

জানা গেছে, বিদেশে মৃত্যুর পর মাসের পর মাস কেটে গেলেও নানা কারণে ক্ষতিপূরণ পায়নি মৃত অনেকের পরিবার। এক যুগের বেশি সময়ে ৩২ হাজারেরও বেশি প্রবাসী কর্মীর লাশ দেশে এসেছে। কিন্তু এর মধ্যে ১২ হাজারের বেশি পরিবার সরকারি ক্ষতিপূরণ পায়নি। আইনি জটিলতায় কর্মস্থল থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেরি হয় বলে জানিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্র। আবার যদি কারও অবৈধ পথে বিদেশে গিয়ে মৃত্যু ঘটে তার দায় মন্ত্রণালয় নেয় না। ওই লাশ স্বজনরা দেশে আনতে মন্ত্রণালয়ের কোনো সহযোগিতাও পায় না। ফলে ওই লাশ আর দেশে আসে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার কারণে লাশগুলো দেশে আসেনি। স্বজনরা নিজেদের টাকা ব্যয় করে হলেও লাশ দেশে আনার জন্য মন্ত্রণালয়ে বার বার গিয়েও কোনো সহযোগিতা পাননি। এরই মধ্যে এসব প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে অনেকেই এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত নেই এমন কারও সঙ্গে এ ব্যাপারে কারও যোগাযোগ করা ঠিক নয়। এতে করে প্রতারণার আশঙ্কা থাকে শতভাগ।

দরিদ্র প্রবাসীদের মরদেহ দেশে আসবে সরকারি খরচে:

ব্যক্তিগতভাবে খরচ জোগাতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেকেই প্রবাসে মারা যাওয়া শ্রমিকের মরদেহ দেশে আনতে পারেন না। অনেক প্রবাসী রয়েছেন, যাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র নেই। যদিও তারা দেশের অর্থনীতিতে রক্তসঞ্চালনের কাজ করছেন। সেই প্রবাসী বিদেশে মারা গেলে মরদেহ আনতে পরিবারকে বিপাকে পড়তে হয়। তাই বিদেশে অবস্থানরত দরিদ্র প্রবাসী মারা গেলে তাদের মরদেহ সরকারি খরচে দেশে আনার বিষয়টি বিবেচনায় কাজ করছে সরকার।

এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে ২৪ জুন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে প্রবাসী কর্মীরা মারা গেলে বিমানবন্দরে মরদেহ হস্তান্তরের সময় সেটি পরিবহন ও দাফনের খরচ হিসেবে সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়া, ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্রবাসে মারা যাওয়া কর্মীর প্রত্যেক পরিবার আর্থিক অনুদান হিসেবে পাচ্ছে ৩ লাখ টাকা। বিমানবন্দর থেকে মৃতদেহ গ্রহণের সময় মৃতের পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

প্রবাসে যত হয়রানিতে নারী শ্রমিকরা:

প্রবাসে গিয়ে কষ্টের আয়ে যে নারী শ্রমিক বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন সেই শ্রমিকরাই বিদেশে গিয়ে শিকার হচ্ছেন অমানবিক নির্যাতনের। কপাল ফেরাতে বিদেশ পাড়ি দিলেও নারী শ্রমিকরা দেশে ফিরছেন লাশ হয়ে। নির্যাতিত যেসব নারী কোনোরকমে মালিকের অত্যাচার থেকে পালিয়ে দেশে ফিরে আসছেন তাদের শরীরেও নির্যাতনের ছাপ স্পষ্ট। দেশে ফিরে এসব শ্রমিকের কেউ কেউ তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ যৌন নির্যাতনের বিষয়ে মুখ খুললেও লজ্জায় মুখ বন্ধ রাখেন অনেকেই। বিদেশে নারী কর্মীদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সামনে বারবার তুলে ধরা হলেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। এ অবস্থায় জাতীয় সংসদেও বিদেশে নারী শ্রমিকদের না পাঠানোর জোর দাবি উঠেছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোও বিষয়টি নিয়ে এখন বেশ চিন্তিত। বিদেশে কাজ করতে যাওয়া বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের তিন ভাগের একভাগই যান সৌদি আরবে। এ ছাড়াও নারী শ্রমিকরা জর্ডান, ওমান, কাতারসহ বেশ কয়েকটি দেশে কাজ করতে যান। এসব দেশে মূলত তাদের গৃহকর্মী হিসেবে

পাঠানো হয়। মূলত সৌদিসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে নারী শ্রমিকরা অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিষয়টি দূতাবাস ও সরকারকে জানানো হলেও তেমন কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যাচ্ছে না। অথচ শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এমনকি পাকিস্তানের নারীদের নির্যাতনের অভিযোগ আছে এমন দেশে নারী কর্মী পাঠানো বন্ধ রেখেছে দেশগুলোর সরকার।

বিএমইটির দেওয়া তথ্য মতে, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশে কাজ করতে গেছেন ৪ লাখ ৭০ হাজার ২৬৫ জন নারী শ্রমিক। যা ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত পরিসংখ্যান হিসেবে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে শুধু সৌদি আরব, ওমান ও কাতার এই তিনটি দেশে যথাক্রমে ২ লাখ ৬৮ হাজার ১১২ জন, ৫৩ হাজার ৯৮১ এবং ৪৪ হাজার ৬৮৪ জন নারী কর্মী গেছেন। ২০১৮ সালে অনলাইনে শ্রমিকরা যেসব অভিযোগ করেন তার মধ্যে শুধু সৌদি আরব থেকেই শ্রমিকদের ১৭৮টি অভিযোগ আসে।

ব্র্যাক মাইগ্রেশনের তথ্য মতে, ২০১৯ সালের ১০ মাসে ৯৫০ জন নারী শ্রমিক সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছেন। বিদেশে কাজ করতে যাওয়া ৪৮ নারীর মৃতদেহ দেশে এসেছে সৌদি আরব থেকে। তবে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের তথ্যে, বিগত কয়েক মাসে দেশে ফিরেছেন ১ হাজার ২৫০ জন কর্মী। ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বিদেশ থেকে লাশ হয়ে দেশে ফিরেছে ৩৯০ জন নারী শ্রমিক।

সবচেয়ে বেশি নারী কর্মীদের মৃত্যু ঘটছে সৌদি আরব, জর্ডান, লেবানন, ওমান ও আরব-আমিরাতে। নিয়োগ কর্তার মাধ্যমে যৌন নির্যাতন, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণের জন্য আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। এছাড়াও অতিরিক্ত কাজের চাপ ও মানসিক যন্ত্রণার ফলে স্ট্রোকজনিত কারণেও তাদের মৃত্যু হচ্ছে। জানা যায়, কাজ করতে গিয়ে নারীরা গড়ে ১৮ ঘণ্টার পরিশ্রম শেষে তিন বেলা খেতে পান শুধু শুকনো রুটি। এসব কারণে সম্প্রতি নারী শ্রমিকদেরও সৌদি আরবে যাওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ কমেছে।

জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদও নারী শ্রমিকদের নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করছি নারী শ্রমিকরা যাতে সম্মানজনকভাবে বিদেশে কাজ করতে পারেন। আর যদি একেবারেই না করতে পারেন তাহলে তাদের না পাঠানোর চিন্তা করব।

অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন সংস্থার (ওকাপ) একটি গবেষণা বলছে, ফেরত আসা নারী কর্মীদের ৬১ শতাংশ নানা ধরনের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। ১৪ শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার হন। ৫২ শতাংশ নারীকে জোরপূর্বক দীর্ঘ সময় কাজে বাধ্য করা হয়। আর নির্যাতনের কারণে অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন ৬৩ শতাংশ নারী। ৮৬ শতাংশকে ঠিকমতো বেতন দেওয়া হয় না।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চের (রামরু) তথ্যে, সৌদি আরবের সেফ হোমে এখনো অনেক নারী দেশে ফেরার অপেক্ষায়। শারীরিক নির্যাতনের ছাপ নিয়ে বহু নারী কর্মী দেশে ফিরেছেন। তবে বেশির ভাগ নারী কর্মী অভিযোগ করেন, তাদের ওপর বাড়ির মহিলা কর্ত্রী শারীরিক অত্যাচার করতেন।

অন্যদিকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির এক বৈঠকে সৌদি আরবে কাজ নিয়ে যাওয়া নারীরা নানা নির্যাতনের পাশাপাশি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন উল্লেখ করে নারী শ্রমিকদের ফিরে আসার ১১টি কারণ চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে একই নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, আবার বেতন-ভাতাও পাননি, এমন একাধিক কারণ রয়েছে। আরো বলা হয়েছে, ফিরে আসা নারী শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মিত বেতন না দেওয়া, পর্যাপ্ত খাবার না দেওয়া, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, ছুটি না দেওয়া, একাধিক বাড়িতে

কাজ করানো, অন্য কফিলের কাছে বিক্রি করে দেওয়া, শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক কারণ, ভিসার মেয়াদ না থাকা, চুক্তি (দুই বছর) শেষ হওয়া এবং অন্যান্য কারণে নারী শ্রমিকরা ফিরে আসছেন।

সৌদি আরবে নারী কর্মীদের সমস্যা নিয়ে ২০১৬ সালের মার্চে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং ঢাকায় প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল। এতে বলা হয়, বিদ্যমান ব্যবস্থায় সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব রয়েছে। দূতাবাস এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনেকটাই গৌণ। পুরোটাই একপেশে এবং সৌদি আরব আরোপিত।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন বা অন্যান্য দেশের চুক্তির মতো বাংলাদেশের সঙ্গে করা চুক্তিতে গৃহকর্ম বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ফলে গৃহকর্মী ও গৃহকর্তা (সৌদি আরবের) উভয়ের কাজ নিয়ে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গরমিল হচ্ছে। এ ছাড়া পর্যাপ্ত ভাষাজ্ঞান না থাকায় গৃহকর্মীরা গৃহকর্তার চড়া মেজাজ ও শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন।

দূতাবাস সূত্র জানায়, নেপাল ১ হাজার ৬০০ রিয়াল (সৌদি মুদ্রা) বেতনের নিচে কোনো নারী কর্মী পাঠাচ্ছে না। আর ফিলিপাইন ১ হাজার ৮০০ বা ২ হাজার রিয়াল ছাড়া কোনো কর্মীকে সৌদি আরবে পাঠায় না। অথচ বাংলাদেশের নারী কর্মীরা পান মাত্র ৮০০ রিয়াল (১৭ হাজার ৬০০ টাকা)।

মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিক নির্যাতন, একটি ঘটনারও বিচার হয়নি:

বিদেশের মাটিতে ঘাম ঝরিয়ে আয় করেন বাংলাদেশের মেয়েরা। তাদের পাঠানো টাকায় দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। তাদের শ্রমে বাড়ে দেশের রিজার্ভ। আর তারাই যখন বিদেশের মাটিতে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা ও পাশবিক নিপীড়নের শিকার হন, তখন তাদের পাশে দাঁড়ায় না কেউ। নির্যাতনের শিকার হলে দেশে ফিরিয়ে এনে দায়িত্ব শেষ করছে দূতাবাস ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। অথচ আজ পর্যন্ত এ ঘটনার একটিরও বিচার হয়নি; সাজা পায়নি কোনো দোষী। এ কারণেই বিদেশের মাটিতে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশের মেয়েদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বেড়েই চলেছে।

সৌদি আরবে গৃহকর্মে নারী শ্রমিক পাঠাতে পারলেই কর্মীপ্রতি দুই হাজার ডলার পায় রিক্রুটিং এজেন্সি। টাকা উপার্জনের এমন সহজ রাস্তা খোলা থাকায়, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদেরও বিদেশে পাঠাচ্ছে এজেন্সি ও দালালরা। পাসপোর্ট দেওয়ার সময় পুলিশের যাচাই-বাছাই করার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না।

বিদেশ যাওয়ার আগে কর্মীর বিস্তারিত তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্ব প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর (বিএমইটি)। তবে দালালের বানানো ভুয়া পাসপোর্ট ও মেডিকেল সার্টিফিকেটে বিদেশ চলে যাচ্ছে কর্মী। বিমানবন্দরেও নেই নজরদারি।

বিদেশে কর্মরত নারী শ্রমিকদের খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব দূতাবাসের। জনবল সংকটের কথা বলে সে কাজটি করছে না দূতাবাস। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড রয়েছে কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা দেখতে। নির্যাতিত কর্মী দেশে ফেরার পর পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে দায়িত্ব সারছে সরকারের এই সংস্থাটি।

যেসব মেয়ে গৃহকর্মীর কাজে সৌদি আরব যান, তারা সবাই হতদরিদ্র। তাদের না আছে শিক্ষা, না আছে প্রশিক্ষণ। দালালের হাত ধরে তারা বিদেশ যান। কীভাবে যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কোন রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের পাঠাচ্ছে-

কিছুই জানেন না তারা। সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণির মানুষ বলে তাদের ওপর নির্যাতন হলে তা আলোচনায় আসে না। কেউ তাদের পাশে দাঁড়ায় না। এ কারণে নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত । তারা জানে, বাংলাদেশি মেয়েদের নির্যাতন করলে শাস্তি পেতে হয় না।

নির্যাতন ও নানা অভিযোগে দেশে ফিরেছেন হাজার হাজার নারী শ্রমিক। অধিকাংশই কর্মক্ষেত্রে মারধর ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। আবার কেউ কেউ হারিয়ে ফেলেছেন বাকশক্তি।

বিমেষজ্ঞরা বলছেন, বিদেশে নারী কর্মীরা পদে পদে প্রতারণার শিকার হন। সৌদি আরবে বাংলাদেশের মেয়েরা মারধর ও ধর্ষণের শিকার হলেও ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া বা অন্য কোনো দেশের মেয়েদের ওপর এমন ঘটনা ঘটে না। কারণ, ওই দেশগুলো তাদের মেয়েদের প্রতি যত্নশীল। নিয়মিত খোঁজখবর রাখে। বাংলাদেশের দূতাবাস সেই তুলনায় কিছুই করে না।

বাংলাদেশের মেয়েরা সৌদি আরবে কাজ করতে যাওয়ার পর প্রথম তিন মাস তার নিরাপত্তার দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্সির। প্রত্যেক মেয়ের পরিবার ও দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ রাখা হয়েছে চুক্তিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে চুক্তির সময়ের তিন মাস পেরোনোর পরই তাদের অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়া হয়। যে বাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার পরেই নেমে আসে নির্যাতন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মী পাঠিয়ে দুই হাজার ডলার পায়, তার দায়িত্ব মাত্র তিন মাস খোঁজখবর রাখা। আইন করতে হবে- কর্মী যতদিন বিদেশ থাকবে, ততদিনই দায়িত্ব নিতে হবে এজেন্সিকে। কোনো মেয়ে নির্যাতিত হলে রিক্রুটিং এজেন্সির কাছ থেকে জবাব দিতে হবে মন্ত্রণালয়কে।

উল্লেখ্য, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী পাঠায় না। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলংকাও দেশটিতে নারী কর্মী পাঠায় না। ২০১১ সালে সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করে দেয় ফিলিপাইন। দেশটির সংসদীয় প্রতিনিধি দলের তদন্তে প্রকাশ পায়, দেশটিতে প্রবাসী নারী কর্মীদের ওপর নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুরু থেকেই ধর্ষণ, নির্যাতন ও মারধরের অভিযোগ করে আসছেন নারী কর্মীরা। এসব অভিযোগের বিষয়ে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী না হওয়ায় সমস্যা দিনে দিনে জটিল হয়েছে বলে মনে করেন অভিবাসন খাতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। তাঁদের মতে, সৌদি পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় নারী কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন। কয়েক দিন পরপর নারী কর্মীদের ফিরে আসার মধ্য দিয়ে অভিবাসনের কঠিন চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রবাসে যাওয়ার আগ্রহ হারাচ্ছেন নারী শ্রমিকরা:

বিদেশে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার আগ্রহ কমছে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের। বিদেশে গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রীর অমানুষিক নির্যাতন এর অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ ছাড়া নির্যাতনের শিকার নারীদের পরিণতি দেখে অনেক নারী বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ হারাচ্ছেন। মূলত ২০১৮ সাল থেকেই বিদেশগামী নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। যার প্রভাব পড়ে ২০১৯ সালেও।

এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (বিএমইটি)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রবাসে নারীদের কাজ করার পরিসংখ্যান বলছে ২০১২ সালে ৩৭ হাজার ৩০৪ জন দেশের বাইরে গিয়েছিলেন। ২০১৭ সালে এটি তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ২১ হাজার ৯৪০ জনে দাঁড়ায়। ঐ বছর বাংলাদেশ থেকে রেকর্ড সংখ্যক নারী বিদেশে কাজ করতে যান। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার এই হার পরের বছর কমে আসে। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ (রামরু) ইউনিট এর 'বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি প্রকৃতি ২০১৮'- এর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৫ সালে আগের বছরের তুলনায় নারীকর্মীদের বিদেশ যাওয়ার হার ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৬ সালে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬ শতাংশ। ২০১৭ সালে তা ছিল ১২ শতাংশ কিন্তু ২০১৮ সালে বিদেশগামী নারী কর্মীর সংখ্যা কমে যায়। যা আগের বছরের তুলনায় ১৭ শতাংশ কম। নারী অভিবাসন কমে আসার পেছনে সংস্থাটি বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করে। ২০১৮ সালে নির্যাতনের কারণে বেশ কিছু নারীকর্মী দেশে ফিরে আসতে শুরু করেন। সংবাদ মাধ্যমে এসব নিগ্রহের কারণ জানতে পেরে অনেক নারীকর্মী বিদেশ যেতে নিরুৎসাহ বোধ করেন। পরিসংখ্যান বলছে ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ ৭৩ হাজার ৭১৩ জন নারী সৌদি আরবে যান। এরপর যথাক্রমে আরব আমিরাতে ২ হাজার ৪২৭ জন, কুয়েতে ১১৫ জন, ওমানে ১১ হাজার ৩৪ জন, জর্ডানে ৯ হাজার ১০০ জন, কাতারে ৩ হাজার ১৯৬ জন, বাহরাইনে ৫ জন নারী কাজ করতে যান।

বিএমইটির তথ্য মতে ২০১৯ সালে এক লাখ চার হাজার ৭৮৬ জন নারী শ্রমিক বিদেশ গেছেন। এরমধ্যে সৌদি আরবে ৬২,৬৭৮ জন, জর্ডানে ১৯,৭০৬ জন, ওমানে ১২,২২৬ জন, কাতারে ৩,৭৪১ জন, আরব আমিরাতে ২৪৮৩ জন নারী শ্রমিক ।

প্রবাসী নারী কর্মীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে:

বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকের সঙ্গে বাড়ছে তাদের নিথর দেহে দেশে ফেরার সংখ্যাও। তারচেয়েও উদ্বেগের বিষয় নারী শ্রমিকদের আত্মহত্যার প্রবণতা। যদিও এই মৃত্যুর আসল কারণ জানার উপায় নেই, পরিবারের। কারণ, বাংলাদেশে মরদেহের ময়না তদন্ত হয় না। অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব আত্মহত্যার কারণ খুঁজে বের করা উচিত সরকারের।

পরিবারের সবাইকে নিয়ে একটু ভালভাবে বাঁচতে বিদেশে পাড়ি জমান নারী শ্রমিকরা। সচ্ছলতা তো ফেরাতে পারেননি, বরং সেখানে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বেছে নেন আত্মহননের পথ। ফিরে আসছেন লাশ হয়ে। বিদেশে কাজ করতে গিয়ে গত তিন বছরে ৪৫ জন বাংলাদেশি নারী শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। যদিও এ পরিসংখ্যান কেবল হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফেরত আসা মরদেহের তথ্য। এর বাইরেও আরো অনেক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মরদেহ এখনো দেশে এসে পৌঁছেনি। আবার অনেক পরিবার মৃত্যুর পর মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে চায় না। ফলে বিদেশে নারী শ্রমিকের আত্মহত্যার বিষয়ে সঠিক তথ্যও পাওয়া যায় না।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে মরদেহ ফেরত আসা নারী কর্মীর মধ্যে মাত্র একজনের মৃত্যুর কারণ হিসেবে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১২। ২০১৮ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ জনে। আর ২০১৯ সালে আগস্ট পর্যন্ত ২০ জন নারী শ্রমিক আত্মহত্যা করেন।

ভাগ্য ফেরাতে বিদেশে গিয়ে নারী শ্রমিকরা আত্মহত্যার কারণ হিসেবে দেখো গেছে অধিকাংশ নারী শ্রমিকই বিদেশে গিয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজের পরিবেশ পাচ্ছেন না, যা তাদের সবসময় মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। এটিই অস্বাভাবিক মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ।

বিদেশে নারী গৃহকর্মী প্রেরণে নিয়ন্ত্রণ আনার উদ্যোগ:

বিদেশে নারী গৃহকর্মী প্রেরণে নিয়ন্ত্রণ আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এখন থেকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ঢালাওভাবে বিদেশে নারী গৃহকর্মী পাঠাতে পারবে না। শর্তসাপেক্ষে কেবল ৫৮টি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমেই নারী কর্মীরা বিদেশে যেতে পারবেন। আর এজন্য অভিবাসন ব্যয় বাবদ নারী কর্মীদের কাছ থেকে কোনো অর্থও নিতে পারবে না রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো।

বিদেশে বাংলাদেশী নারী গৃহকর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে এমন বিভিন্ন নিয়ম বেঁধে দিয়ে ৯ অক্টোবর একটি সরকারি আদেশ জারি করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ শাহীন স্বাক্ষরিত ওই আদেশে বিদেশে নারী গৃহকর্মী পাঠাতে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনপ্রাপ্ত ৫৮টি রিক্রুটিং এজেন্সির একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। আর এসব এজেন্সির ওপর আরোপিত শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে নারী গৃহকর্মী পাঠাতে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিটি রিক্রুটিং এজেন্সিকে নিরাপত্তা জামানত বাবদ ১৫ লাখ টাকা এফডিআর আকারে বিএমইটির মহাপরিচালকের অনুকূলে লিয়েনমার্ক করে জমা দিতে হবে। কেবল নিরাপত্তা জামানত বাবদ ১৫ লাখ টাকা জমা দেয়ার পরই সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি বিদেশে নারী গৃহকর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে। গৃহকর্মীর কাছ থেকে অভিবাসন ব্যয় বাবদ কোনো অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো।

বাংলাদেশী নারী কর্মীদের প্রবাসযাত্রার শুরু নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে। এরপর ২০১৪ সাল থেকে বড় পরিসরে সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে বাংলাদেশী নারী কর্মী রপ্তানি বাড়তে থাকে। এসব নারীর প্রত্যেকেই আরেকটু ভালো থাকার আশায় দেশটিতে গেলেও মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাদের অনেককেই। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিদেশে নারী গৃহকর্মী রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণ আনার এ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এজেন্সির গাফিলতির কারণে যাতে কোনো নারী গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার না হয়, সেজন্য এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নারী গৃহকর্মীদের অভিবাসন ব্যয়ও শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে এর মাধ্যমে।

নারী কর্মীদের সুরক্ষায় সরকারের ১২ নির্দেশনা:

বাংলাদেশ থেকে গত তিন বছরে প্রায় তিন লাখ নারী কাজের জন্য সৌদি আরবে গেছেন। এর মধ্যে চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই ফিরে এসেছেন সাড়ে আট হাজার নারী। তাঁদের অনেকে যৌন নির্যাতনসহ নানা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হওয়ার কথা বলেছেন। এ অবস্থায় নারী কর্মীদের সুরক্ষায় ১২টি নির্দেশনাসহ একটি পরিপত্র জারি করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বর্তমানে সৌদি আরবে যাওয়ার আগে জনশক্তি, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে নারী কর্মীরা ৩০ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ নেন। নতুন পরিপত্র অনুযায়ী, তাঁদের প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করবে তৃতীয় একটি পক্ষ। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যাওয়ার আগে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত নারী কর্মীর তালিকাসহ বিস্তারিত তথ্য সরকার গঠিত কমিটির কাছে হাজির করতে হবে।

বয়স কমবেশি দেখানো, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়া কোনো নারী কর্মীকে সৌদি আরবে পাঠানো হলে দায়ী এজেন্সির বিরুদ্ধে তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে পরিপত্রে। এতে বলা হয়েছে, এখন থেকে নারী কর্মীদের দুই দফায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পাঠানোর আগে একবার এবং বহির্গমন ছাড়পত্র নেওয়ার সময় আরেকবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে।

নারী শ্রমিকদের সুরক্ষায় ব্যবস্থা নেবে সৌদি কর্তৃপক্ষ:

নারী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছে সৌদি কতৃপক্ষ। বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে দুপক্ষ এ বিষয়ে সমঝোতায় পৌছায়। তার জন্য এ সংক্রান্ত আইটি প্ল্যাটফর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মী, দুই দেশের রিক্রুটিং এজেন্সি ও নিয়োগকর্তার পূর্ণ ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্য যুক্ত করা হবে, যে কর্মীরা কাজ ত্যাগ করেছেন তাদের পুলিশ পুনরায় নিয়োগকর্তার কাছে হস্তান্তর করবে না এবং কর্মী যত দিন কর্মরত থাকবেন, তত দিন তার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ও সৌদি রিক্রুটিং এজেন্সি বহন করবে। নারী কর্মীদের কাজের মেয়াদ শেষ হলে সৌদি রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের নিরাপদে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। সৌদি শ্রম আদালতে মামলা করার পদ্ধতি আরো সহজ করার বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়। অসুস্থ কর্মীদের চিকিত্সা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমানে স্বাস্থ্যবীমা করার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষ / কোম্পানী/ নিয়োগকারীদের বাধ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রবাসে অবৈধ বাংলাদেশি শ্রমিক:

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রচুর বাংলাদেশি বিদেশ-বিভুঁইয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মপ্রার্থী লোকের অভিগমন বেশি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি অভিবাসী রয়েছে। কেউ বৈধ উপায়ে গেছে, কেউ গেছে অবৈধ উপায়ে। বর্তমানে মালয়েশিয়ায় বৈধ সাড়ে ছয় লাখ বাংলাদেশি রয়েছে। সেখানে কর্ম সনদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা অন্য কারণে অবৈধ হয়ে পড়া বাংলাদেশির

সংখ্যা প্রায় তিন লাখ। অবৈধরা রয়েছে চরম আতঙ্কে। গ্রেপ্তার আতঙ্কে তাদের অনেকে রাতের বেলায় বাসস্থান ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে থাকে।

মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, আগামী পাঁচ বছরে সব অবৈধ বিদেশিকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। তাদের ধরার জন্য সমন্বিত অভিযান চালানো হবে। শুধু কারখানা, মার্কেট বা অফিসে নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়েও অভিযান চালানো হবে। এরমধ্যে গত জানুয়ারি থেকে ৪ জুন পর্যন্ত মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ সাত হাজার ৯০০টি অভিযান চালিয়ে ২৩ হাজার ২৯৫ জন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে পাঁচ হাজার ২৭২ জন বাংলাদেশি রয়েছে।

মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশিদের অনেকে ঠিকমতো বেতন না পাওয়া, দালালদের নানা প্রতারণা ও জালিয়াতির কারণে তারা অবৈধ হয়ে পড়েছে। বৈধতাবিষয়ক পুনঃ শুনানির জন্য টাকা জমা দিয়েও শ্রমিকরা বৈধ হতে পারেনি।

সাধারণ পর্যায়ের কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন কত যে কঠিন; পরিস্থিতি যে কত নির্মম সে বিষয়ে প্রায় সবাই অবহিত। অবৈধ হয়ে পড়লে বা অবৈধভাবে গেলে তো কথাই নেই। অভিযোগ রয়েছে, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ও মালয়েশিয়ার একটি সিন্ডিকেট চায় না অবৈধ অভিবাসীরা বৈধ হোক। আবার অবৈধ হয়ে পড়া অনেকে বৈধ হওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে পারে না। দালাল চক্রের জটিলতা আর কিছু বেসরকারি খাতের জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লাগামহীনতা এগুলোর পিছনে বড়ো ভূমিকা পালন করছে। আবার বিদেশগমণকারী শ্রমিকদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সঠিক তথ্যের অপ্রাপ্তি এবং অজ্ঞতার কারণেই এটা সম্ভব হচ্ছে। তাই সহজেই তারা দালাল চক্র এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বশে চলে আসে।

বেআইনি অভিবাসন অপ্রতিহত:

অবৈধভাবে বেআইনি পথে সাগর-মরু-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে ভাগ্যের খোঁজে যেসব শ্রমিক দেশ ছাড়ছেন, তাঁদেরও কয়েক লাখ টাকা করে খরচ হয়। থাকে জীবনের ঝুঁকি। ২০১৯ সালের ৯ মে লিবিয়া থেকে তিউনিসিয়ার উপকূল হয়ে ইতালি যেতে গিয়ে মারা যান ৩৯ বাংলাদেশি। প্রায়ই মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ, মালয়েশিয়া ও ইউরোপের কিছু দেশে অবৈধ অভিবাসীদের আটক হওয়ার খবর জানা যায়। ইউরোপীয় কমিশনের পরিসংখ্যান অধিদপ্তর ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, গত আট বছরে বেআইনিভাবে ইউরোপে গেছেন ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মতে, গত ১০ বছরে সরকার বিভিন্ন দূতাবাসে ১৭টি শ্রম শাখা খুলেছে। আগে এর সংখ্যা ছিল ১৩। সরকার চেষ্টা করছে এই ভাগান্বেষীদের দুর্ভোগ কমাতে। কিন্তু বেআইনি অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় বিদেশি চক্রও জড়িত থাকে। সরকার পেরে ওঠে না।

তবুও চলছে মরণযাত্রা:

সংসারের অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পেতে স্বামী-সন্তান রেখে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন উত্তরাঞ্চলের এক গৃহবধূ। কাজ করতে অক্ষম স্বামী ও সাত বছরের বাচ্চার খরচ মেটাতে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ ছাড়েন। গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে তার যাওয়ার কথা ছিল লেবানন। সেজন্য ৯০ হাজার টাকা দিয়েছেন রিক্রুটিং এজেন্সিকে। লেবানন যাবেন বলে

এয়ারপোর্টে গিয়ে বিমানে ওঠেন। কিন্তু বিমান থেকে নামার ৬ ঘণ্টা পর জানতে পারেন তিনি লেবানন নন, গিয়েছেন সিরিয়ায়। সেখানেই যৌনকর্মী হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল তাকে। একটানা নয় মাস চলে এই নির্যাতন।
মানব পাচার আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড, অন্যদিকে অভিবাসন আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছরের জেল। মানব পাচারকে প্রায়ই ঘৃণ্যতম অপরাধ হিসেবে বক্তব্য-বিবৃতি প্রচার করা হয়। দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে মানব পাচার বন্ধে সর্বোচ্চ নজরদারির কথা বলা হলেও তা শুধু মুখে মুখেই। আর প্রয়োগ না করায় ২০১২ সালে সরকারের করা কঠোর আইন শুধু কাগজ-কলমেই রয়ে গেছে। দুর্গম পথে বিদেশযাত্রা ও মানব পাচারের মতো অপরাধ এখনো বেপরোয়াভাবে চলার প্রধান কারণ বিচারহীনতা। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে নজরদারির দুর্বলতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রতার কারণে কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা করছে না মানব পাচারকারীরা।

তথ্য মতে সারা দেশে মানব পাচার আইনে এখন পর্যন্ত মামলা হয়েছে ৪ হাজার ৬৬৮টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৪৫টি, বিচারাধীন রয়েছে ৪ হাজার ১০৬টি, আদালত স্থানান্তর হয়েছে ৩১৭টি মামলার। উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্থগিত রয়েছে ৭টি। নিরাপদ অভিবাসন কর্মীরা বলছেন, নিষ্পত্তি হওয়া মামলার মধ্যে আপসরফার সংখ্যাই বেশি। বাকিগুলোয় চলছে দীর্ঘসূত্রতা। অথচ মানব পাচার আইনে ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগ গঠন এবং ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ করার কথা থাকলেও নানা জটিলতায় আটকে আছে মামলাগুলো। এতে অভিযুক্তরা জামিনে বেরিয়ে আবারও মানব পাচারে সক্রিয় হচ্ছে।

একই অভিমত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরেরও। 'ট্রাফিকিং ইন পারসন ২০১৯' শীর্ষক প্রতিবেদনে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, বাংলাদেশ সরকার মানব পাচার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিলেও তা কাজে আসছে না। প্রতি বছর বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এর আগে ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে রেখেছিল দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ টায়ার-টুতে। ২০১৭ সালে এক ধাপ নামিয়ে বাংলাদেশকে টায়ার-টুর 'নজরদারিতে থাকা দেশের' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই বলে এখন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মন্তব্য। সর্বশেষ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'ট্রাফিকিং ভিকটিম প্রটেকশন অ্যাক্ট'-এর কারণে বাংলাদেশকে টায়ার-থ্রিতে নামিয়ে দেওয়া হয়নি। এজন্য টানা তৃতীয়বারের মতো টায়ার-টু নজরদারি তালিকায় রাখা হলো। তবে অভিবাসন খাতে অবৈধ মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় পাচারের ঝুঁকি আরও বেড়ে গেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে এ তালিকায় আরও রয়েছে কঙ্গো, গ্যাবন, হাঙ্গেরি, ইরাক, মালয়েশিয়া, রোমানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, আফগানিস্তানসহ ৩৮টি দেশ।

বিশ্বব্যাপী মানব পাচারকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন। মুখে কঠোর হওয়ার কথা থাকলেও এখানে পাচার নিয়ে সরকারের কোন অংশ কাজ করবে তা নিয়েই রয়েছে সমন্বয়হীনতা। যখনই পাচারের বিষয় আসছে, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় মনে করে এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবার অনেক সময় মনে করে এটা প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাজ। সমন্বয়ের এ অভাব সরকারের সদিচ্ছাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সঠিক তথ্যের অপ্রাপ্তি এবং অভিজ্ঞতার অভাব:

শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে কি কাজ করবে অনেক সময় তা তারা আগে থেকে জানতে পারে না। এমনকি সরকারি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে যারা বিদেশ যাওয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারাও জানে না বিদেশে গিয়ে কি কাজ করবে। বাধ্য হয়ে তখন ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। যেটি তাদের জন্য অনেক বড়ো মানসিক চাপের কারণ। আবার শ্রমিকের নিজ দক্ষতার স্বীকৃতি বা সার্টিফিকেট না থাকাও তাদের ভালো কাজ পাওয়ার পথে বড়ো

একটি অন্তরায়। প্রবাসী শ্রমিকরা যে যে কাজে দক্ষ সে দক্ষতার স্বীকৃতি থাকলে ভালো কাজ পেতে সহায়ক হয়। যেটি বাংলাদেশের শ্রমিকরা পায় না। প্রবাসীদের কর্মপরিবেশকে নিরাপদ করতে হলে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রবাস গমন-সম্পর্কিত সঠিক তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ এই তথ্যের অপ্রাপ্তির কারণেই তারা নানাবিধ হয়রানির শিকার হয়। আর মানসিক চাপের বীজ বপিত হয় দেশের মাটিতেই। বিদেশগামী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দক্ষতার স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। কাজের অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য টিটিসিগুলো চুক্তিপত্র দেখে তাদেরকে ভর্তি করলেও কিছুটা লাঘব হবে, দালালের দৌরাত্ম্যও কমবে। সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষণের সংখ্যা এবং মেয়াদ বাড়ানো জরুরি।

একই সঙ্গে কূটনৈতিক তত্পরতা চালিয়ে আরো বেশি দক্ষ-আধাদক্ষ শ্রমিক রপ্তানির উদ্যোগ নিলে অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। যে দেশে কর্মীরা যায় সে দেশের নিয়োগকর্তাদেরও তাদের সরকারের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এটি কূটনৈতিকভাবেই উদ্যোগ নিলেই কেবল সম্ভব হবে। পাশাপাশি ডাটাবেজ এবং নিয়মিত মনিটরিং করলে সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব।

দক্ষতার অভাবে কম মজুরি পাচ্ছে বাংলাদেশী শ্রমিকরা:

জনশক্তি রপ্তানিতে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কর্মীরা নিয়োজিত আছে পৃথিবীজুড়ে। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স তৈরি পোশাকের পরে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশি শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে। দেশে বেকারত্বের হার কমছে এবং অর্জিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। দূর বিদেশে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা যে রেমিট্যান্স পাঠায় সেই টাকায় আমরা দেশে বসে উন্নয়নের নানা ছক কষি কিন্তু খুব কম সময়ই ভাবি বিদেশ থেকে যারা দেশের উন্নয়নে এত বড়ো ভূমিকা রাখছে তারা কতটুকু দক্ষ।

বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরা যদি ভালো না থাকে, দেশ ও দেশের অর্থনীতিও ভালো থাকবে না কারণ আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি রেমিট্যান্সের পরিমাণ কমে যাবে। ভিন দেশে গিয়ে তারা খুব একটা ভালো থাকতেও পারে না। তার অন্যতম একটি কারণ হলো বর্তমান পুঁজিবাদী ও কর্মমুখী শ্রমবাজার চায় দক্ষ শ্রমিক। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যারা যাচ্ছে তাদের বেশিরভাগই অদক্ষ। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত প্রায় ৫০ ভাগ শ্রমিকই অদক্ষ, ২০ ভাগ সেমি-দক্ষ, ২৭ ভাগ দক্ষ এবং মাত্র ২ থেকে ৩ ভাগ প্রফেশনাল শ্রমিক। আবার যাদের দক্ষ বলা হয় তাদের মাত্র এক মাসের একটি ট্রেনিং দিয়েই দক্ষর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ফলে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সাধারণত নিম্ন স্তরে ও অল্প বেতনে কাজ করতে হয়, এজন্য আয়ও কম হয়। বেশিরভাগ শ্রমিক দেশে কৃষিকাজ করে আর বিদেশ গিয়ে ভবন ও সড়ক নির্মাণ, ইলেকট্রিশিয়ান, তৈরি পোশাক, গৃহকর্মী ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হয় এবং দক্ষতার অভাবে কঠোর পরিশ্রম করেও প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশ থেকে কম সংখ্যক শ্রমিক প্রেরণ করে প্রায় দ্বিগুণ রেমিট্যান্স অর্জন করে ফিলিপাইন। কারন ফিলিপাইনের শ্রমিকরা বাংলাদেশী শ্রমিকদের তুলনায় অধিক দক্ষ। এ থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় দক্ষতার অভাবে আমাদের শ্রমবাজার মার খাচ্ছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও তা বিদেশে প্রেরণ করতে পারলে রেমিট্যান্স অর্জন কয়েক গুন বেড়ে যাবে যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শুধু সংখ্যায় না বাড়িয়ে উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কর্ম ও ভাষা দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ পাঠাতে হবে।

এখনো অধিকাংশ মানুষ বিদেশে কাজ করতে যায় কোনো দক্ষতা ছাড়া দালালের মাধ্যমে, এজন্য অনেক সময় তারা প্রতারিত হয় কিন্তু যখন বুঝতে পারে তখন আর কিছুই করার থাকে না। ভিটেবাড়ি বন্ধক রেখে বিদেশে গিয়ে যখন প্রতারিত হয় এবং দক্ষতার অভাবে অধিক পরিশ্রম করেও কাঙ্খিত অর্থ না পায় তখন চারদিক থেকে হতাশ হয়ে পড়ে ও অনেকে স্ট্রোক করে মারা যায়।

বাংলাদেশী শ্রমিকরা যে দেশে যায় সে দেশের কৃষ্টি-কালচার এবং ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নিয়ে যায় না। ফলে শুরুর দিকে নিত্যদিনের কাজ চালিয়ে নিতে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজ ও ভাষার দক্ষতা না থাকায় অধিক পরিশ্রমের পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়।

তবে খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, এলোপাতাড়ি নয়, বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী কাজের প্রশিক্ষণ দরকার। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কা তেমনটাই করছে।

উন্নয়নে প্রবাসীদের সরাসরি যুক্ত করার উদ্যোগ:

রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। কিন্তু এবার শুধু রেমিটেন্সে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না সরকার। এজন্য দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি প্রবাসীদের যুক্ত করার উদ্যাগ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গঠন করা হচ্ছে এনআরবি সেল। ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে এই সেলের রূপরেখার (সাংগঠনিক কাঠামো) খসড়া। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এটি গঠনের পর পরিচালনাও করবে। দেশে বিনিয়োগের সঙ্গে প্রবাসীদের যুক্ত করতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি ওয়েবসাইট থাকবে। সেখানে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তারপর তারা কোন সেক্টরে বিনিয়োগে আগ্রহী, সে বিষয়ে প্রস্তাব দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

এনআরবি সেলের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো হচ্ছে, সেলের প্রধান বা পরিচালক ও ফোকাল পয়েন্ট থাকবেন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন। তাকে সহায়তার জন্য আরও তিনজন কর্মকর্তা থাকবেন। তারা হবেন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন, পার্সোনাল অফিসার একজন এবং অফিস সহায়ক একজন। এর আওতায় থাকবে আরও চারটি শাখা। এগুলো হচ্ছে কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা ও ভৌত অবকাঠামো, শিল্প ও শক্তি এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো। এগুলোর প্রত্যেকটির নেতৃত্বে থাকবেন একজন করে অতিরিক্ত পরিচালক, ডেপুটি সেক্রেটারি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টেনো টাইপিস্ট এবং অফিস সহায়ক।

এছাড়া আরও পাঁচটি উইং থাকবে। এগুলো হচ্ছে- আফ্রিকা ও ওশেনিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য। এগুলোর নেতৃত্বে থাকবেন একজন করে ডেপুটি সেক্রেটারি। তাদের সহায়তার জন্য একজন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্টেনো টাইপিস্ট এবং অফিস সহায়ক থাকবেন।

জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন:

শ্রম অভিবাসনকে নিরাপদ ও নিয়মিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৬ এর পরিশিষ্ট-১ (খ) অনুসরণে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সভাপতি করে জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সরকার, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষক ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে ৬০ সদস্যের জাতীয় অভিবাসী ফোরামের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদস্যগণ

অভিবাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। এর মধ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ কর্মী প্রেরণ, বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে অভিবাসী কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ, শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী টিটিসিসমূহের কারিকুলাম সময়োপযোগীকরণ, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ মনিটরিং ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

প্রবাসী কর্মীদের জন্য হটলাইন চালু:

সম্ভাব্য অভিবাসী, প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যসহ সবাইকে অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের তথ্যসেবা দিতে হটলাইন চালু করেছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এবং ব্র্যাক। নম্বরটি হলো- ০৮০০০১০২০৩০। যে কেউ বিনা খরচে এই নম্বরে ফোন করে অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবেন।
পাশাপাশি বিদেশ থেকেও অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যসেবা পাওয়া যাবে +৯৬১০১০২০৩০ নম্বরে ফোন করে। বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ফোন করে সরাসরি তথ্যসেবা পাওয়া যাবে। এ সময়ের বাইরে ফোন করলে সে ফোনকলটির রেকর্ড থেকে পরবর্তীতে কলদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

শ্রমিক স্বার্থ নয়, দলাদলিতেই ব্যস্ত বায়রা:

জনশক্তি রপ্তানির উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার থাকার কথা জনশক্তি প্রেরক এজেন্সিগুলোর সংগঠন বায়রার। কিন্তু জনশক্তির রপ্তানি পরিস্থিতির মানোন্নয়নে তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকাই রাখতে পারছে না সংগঠনটি। ব্যক্তিস্বার্থ ও দলাদলি বায়রার ভিতরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শ্রমবাজারের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলায় বহিষ্কার করা হয়েছে কার্যকরী কমিটির তিনজনকে। বায়রা আয়োজিত এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দলাদলির বিষয়টি আরও এক দফায় প্রকাশ্যে এসেছে। মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবের শ্রমবাজার নিয়ে ঐ মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন বায়রার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু বায়রার কার্যনির্বাহী কমিটির দুই সহসভাপতি, অর্থসম্পাদকসহ প্রায় ডজনখানেক নেতাকে সেখানে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। এ বিষয়ে বায়রার সহসভাপতি শফিকুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, 'এত দিন শ্রমবাজার ও বায়রার কথা চিন্তা করে আমরা কিছু বলিনি। কিন্তু সংগঠনের স্বার্থবিরোধী কোনো ধরনের কর্মকান্ড আমরা মেনে নেব না।' তিনি অভিযোগ করেন, বায়রার সাধারণ সদস্যদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারীদের সংগঠন থেকে বহিষ্কারেরর মতো অগণতান্ত্রিক ও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য ট্রেডবডি বায়রার বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে বিতর্কে জড়িয়েছে বায়রা।

অভিবাসী শ্রমিক এবং মানিকগঞ্জ:

জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইওএম সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলছে, বর্তমানে বিশ্বে অভিবাসীর সংখ্যা ২৭ কোটি। গত ১০ বছরে এই সংখ্যা বেড়েছে ১২ কোটি। বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসীর সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে। ১৯৭৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ শ্রম অভিবাসী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। বাংলাদেশের নারীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। এ পর্যন্ত সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন এমন নারী শ্রম অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৯ লাখের মতো।

বাংলাদেশের যেসব জেলা থেকে বিদেশে শ্রমিক যায় তার মধ্যে অন্যতম মানিকগঞ্জ জেলা। বিএমইটির হিসেব মতে ২০১৯ সালে দেশের শীর্ষ অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণকারী জেলাসমূহের মধ্যে ১৮ তম অবস্থানে রয়েছে মানিকগঞ্জ। তবে

সামগ্রীকভাবে এটি দেশের ১৮তম অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণকারী জেলা হলেও নারী শ্রমিক প্রেরণকারী জেলাসমূহের মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে।

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক বিদেশ যায় মুলত মধ্যপ্রাচ্যে । মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার এবং বাহরাইনে বাংলাদেশী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি গমন করে থাকে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও গমন করে। ব্যতিক্রম নয় কমানিকগঞ্জ থেকে যাওয়া শ্রমিকরাও। কমানিকগঞ্জের সাতটি উপজেলা থেকেও সবচেয়ে বেশি মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গমন করে। এছাড়া ইউরোপের কিছু দেশেও মানিকগঞ্জের শ্রমিকরা যায়।

মানিকগঞ্জে শিক্ষার হার ৫৬%। মূলত কম শিক্ষিত এবং নদী ভাঙ্গন এলাকা হওয়ায় এখান থেকে মানুষ কাজের জন্য বিদেশ গিয়ে থাকে। অভাবের তাড়না কিংবা বেশি উপার্জনের আশায় শ্রম বিক্রি করতে প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছেন এখানকার শ্রমিকরা। অনেক নারী শ্রমিক এখান থেকে পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে বিদেশ গমন করে থাকে। শিক্ষা এবং দারিদ্রতার পাশাপাশি রয়েছে পরিবারে তার দায়িত্ব ও ভূমিকা, পারিবারিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণ।

বিএমইটির সূত্র মতে ২০০৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এখান থেকে ১,৮৭,৭৭৮ জন শ্রমিক কাজের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এরমধ্যে ২০১৯ সালে ১৪ হাজার ৭৫৫ জন শ্রমিক বিদেশ গেছেন। এদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যে। এছাড়া ২০০৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এখান থেকে প্রায় ৫০ হাজার নারী শ্রমিক বিদেশ গমন করেছেন।

মানিকগঞ্জে বিল্‌স কার্যক্রম এবং নারী শ্রমিকদের কথা:

দিন যতই যাচ্ছে ততই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে। একই সাথে বাড়ছে নারী শ্রম অভিবাসীর সংখ্যাও। বিদেশে নারী শ্রমিক যাওয়ার সংখ্যা বাড়লেও বিদেশের মাটিতে নারী অভিবাসীদের বড় অংশই খুব একটা ভালো নেই। সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার বিচারে তারা বেশ নাজুক অবস্থার মধ্যে পতিত। অনেক জায়গাতে তাঁরা বহুবিধ ঝুঁকির মধ্যেও রয়েছে। অনেক নারী শ্রমিক নিপীড়িত নির্যাতিত হয়ে কারো সহায়তা না পেয়ে নীরবে নিভৃতে দেশে ফিরে এসেছেন। বিদেশে বাংলাদেশী নারী নির্যাতনের চিত্র নতুন নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেশে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়া হয় না। তাছাড়া অন্যান্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করানো, বেতন সময়মতো পরিশোধ না করা, দীর্ঘ সময় খেতে না দেয়া, অবসর-বিনোদন-ছুটির ব্যবস্থা না করা, নিরাপত্তাহীনতা, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি। এসব নারী শ্রমিক যখন দেশে ফিরে আসেন, পরিবার ও সমাজও তাদের সহজভাবে গ্রহণ করে না।

২০০৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে সাত লাখ ৬৮ হাজার ৮২৯ জন নারী শ্রমিক কাজ নিয়ে বিদেশ গেছেন। সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন ঢাকা থেকে। এ সময়ে প্রায় ৯০ হাজার নারী এই জেলা থেকে কাজ নিয়ে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এরপরই দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ঢাকার পাশের জেলা মানিকগঞ্জ। জীবিকার তাগিদে মানিকগঞ্জ থেকে প্রায় ৫০ হাজার নারী পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে।

কেস স্টাডি-০১: সত্য হলো নাজমা বেগমের স্বপ্ন

নাজমা বেগম। বয়স ৪৫। চার সন্তানের জননী। স্বামী নেই, মারা গেছেন। বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরের কাঞ্চনপুর এলাকায়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিবার। অভাবের সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে এক দালালের মাধ্যমে ৭০ হাজার টাকা খরচ করে ২০১১ সালের মার্চে গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে লেবানন যান নাজমা বেগম। সেখানে মাসে ১২৫ ডলার (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১০,০০০) করে পেতেন নাজমা। ২০১৪ সালে সেখান থেকে দেশে ফিরেন তিনি। ২০১৫ সালে তিনি আবার দালালের মাধ্যমে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে দোকানের কাজ নিয়ে দুবাই যান তিনি। সেখানে তার মাসিক বেতন ধরা হয় এক হাজার দিরহাম (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ২২ হাজার টাকা)। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন তার কাজের ধরন পরিবর্তন হয়ে গেছে। দোকানের কাজের পরিবর্তে তাকে দেওয়া হয় গৃহকর্মীর কাজ। তার কিছুদিন পর দুবাইয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস তার কাজ পরিবর্তন করে একটি শপিং মলে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। সেখানে তার কাজ ছিল কাপড় বিতরণ করা। সেখানে দুই বছর কাজ করে তিনি আবার দেশে আসেন। দেশে এসে তিনি অবসর জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালের জানুয়ারিতে তিনি আবার বিদেশ গেছেন। এবার গমন সৌদি আরব। সেখানে তিনি তার কাজ এবং কাজের পরিবেশে খুশি। চুক্তি মোতাবেক নিয়মিত বেতনও পাচ্ছেন।

অভাবের সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়েছেন নাজমা বেগম। একইসাথে সফল মা হিসেবে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা করাতে সক্ষম হয়েছেন। হরিরামপুরের ঝিটকা এলাকায় তিনি তিন কাঠা জমি কিনে সেখানে ঘর তুলেছেন। তার বড় মেয়ে শামীমা ইসলাম বাংলাদেশ পুলিশ বাহীনিতে চাকরি পেয়েছেন। আরেক মেয়ে দ্বাদশ শ্রেনীতে পড়েন। ছেলে দুটিও পড়াশোনা করছেন। তিনি একজন সফল অভিবাসী শ্রমিক যিনি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

কেস স্টাডি-০২: সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের উন্নয়নে কাজ করতে চান বিদেশ ফেরত হামিদা

হামিদা বেগম (৪৫)। মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার ভাটারা গ্রামের বাসিন্দা। চার সদস্যের সংসার চালাতে হিমসিম খান স্বামী চাঁন মিয়। অভাব যেন সংসারের নিত্যসঙ্গী। চাঁন মিয়া যখন জানতে পারলেন তার স্ত্রী হামিদা সন্তান প্রত্যাশা করেন তখন তিনি খুশি হওয়ার পরিবর্তে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবতেছিলেন কিভাবে অভাবের সংসারে তিনি সন্তান লালন পালন করবেন। কিন্তু দু:খের বিষয় সঠিক চিকিস্যার অভাবে তার সন্তান পৃথীবির আলো দেখতে পায়নি। তারপর পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেন তিনি। একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিন মাসের সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বিদেশ যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট করেন। শ্বশুরের একটা জমি বিক্রি করে জর্ডান যাওয়ার প্রস্তুতি নেন তিনি।

পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে গার্মেন্টেসে চাকরি নিয়ে তিনি জর্ডান যান ২০০১ সালে। সেখানে তার মুজরি ধরা হয় বাংলাদেশী টাকায় ১১,৯০০ টাকা। সেখানে ভালোই যাচ্ছিল তার সময়। প্রতি মাসে ৭ হাজার টাকা করে দেশে পাঠাতেন স্বামীর কাছে। স্ত্রীর পাঠানো টাকায় তিনি একটি জমি কিনেন এবং সেখানে থাকার ঘর তৈরি করেন। কিছু টাকা তিনি ব্যাংকেও জমা রাখেন। পাঁচ বছর পর তিনি দেশে এসে দেখেন তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করেছেন এবং সে সংসারে একটি সন্তানও আছে।

হামিদা ওই পরিবারের সাথে থাকতে চান নি। তাই তিনি তিন মাস পর গার্মেন্টেসে কাজের ভিসা নিয়ে মালয়েশিয়া যান। সেখান থেকেও তিনি তার স্বামীর কাছে টাকা পাঠাতেন। পাঁচ বছর পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তার সৎ পুত্রকে সিঙ্গাপুর পাঠাতে প্রচুর টাকা খরচ করেন। সমস্ত অর্থ নিয়ে তার স্বামী এবং সৎ পুত্র তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

তার কাছে থাকা বাকী টাকা দিয়ে তিনি একটি গরু এবং কয়েকটি ছাগল কিনেন। এরপর তিনি মানিকগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর একজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে জানতে পারেন সেখান থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। একদিন তিনি বিল্‌স অফিসে আসেন এবং তার অবস্থা বর্ণনা করেন। বিল্‌স জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে তাকে গবাদী পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর হামিদা পশু পালনে আরো বেশি মনোনিবেশ করেণ। বর্তমানে তার খামারে দুটি গরু এবং আটটি ছাগল রয়েছে। এছাড়া তিনি কিছু হাঁস-মুরগিও পালন শুরু করেছেন।

বিল্‌স এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর হামিদা এখন একজন সফল কৃষক হতে চান। এছাড়া তিনি একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। তিনি চান সকল নারী যেন তার নিজের পায়ে তাড়াতে পারেন।

কেস স্টাডি-০৩: অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত জীবনের আশাবাদী বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিক আনোয়ারা বেগমের

দুই সন্তানের জননী আনোয়ারা বেগমের (৩০) বাড়ি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার কদমতলা ইউনিয়নে। আনোয়ারার স্বামী বাদশা মোল্লা ছোটখাট ব্যবসা করেন এবং তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। নিজের পরিবার ছেড়ে এবং সন্তানদের পড়াশোনা ও উন্নত জীবনের জন্য স্বপ্ন দেখেন বিদেশ যাওয়ার। স্বপ্ন পূরণে একসময় দু:সম্পর্কের এক আত্বীয়ের মাধ্যমে ৭০ হাজার টাকা খরচে গৃহকর্মী হিসেবে ওমান চলে যান। বিদেশ যাওয়ার আগে তার কাছে জমা টাকা ছিল মাত্র ৫ হাজার টাকা। বাকী টাকা তিনি ঋণ হিসেবে নিয়েছেন বেসরকারী সংস্থা আশা এবং ব্রাক থেকে। ওই আত্বীয় তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল বিদেশে তার উপর কোন ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন হনে না। বিদেশে স্বজনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি ১৫ হাজার টাকা খরছে ঢাকার দারুস সালাম এলাকার বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিদেশ যাওয়ার আগে তিনি প্রি-প্রস্থাণ প্রশিক্ষণ এবং বিএমইটি থেকে স্মার্ট কার্ড়ও নিয়েছেন।

ওমান গমনে তেমন কোন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়নি তাকে। বাংলাদেশে বিমান বন্ধরে তিনি নির্দিষ্ট গাইড়লাইন অনুসরণ করে পৌছে গেছেন ওমানে। সেখানে সেই আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি পৌছেও যান তার নির্দিষ্ট কর্মস্থলে।

যে বাড়িতে তিনি গৃহকমী হিসেবে কাজ করার জন্য গিয়েছিলেন সেখানকার সকলেই মোটামুটি ভালো ছিলেন শুধুমাত্র গৃহপরিচারিকা ছাড়া। শুরুতে সেখানে কাজ করতে সমস্যা হলেও একটা সময় তিনি কাজে অব্যস্থ হয়ে যান। গৃহপরিচারিকা তাকে প্রায়ই নানা ধরণের নির্যাতন করতেন। প্রায়ই তাকে দিনের বেলায় কোন খাবার খেতে দিতেন না। দিন দিন এটা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো এবং নির্যাতনের পরিমান বাড়তে থাকায় মাত্র সাড়ে পাঁচ মানের মাথায় তিনি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। বিদেশ যেতে যে টাকা খরচ হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম টাকা তিনি সেখানে উপার্জন করতে সক্ষম হন। দেশে ফেরত এসে তিনি এখন বেকার জীবন যাপন করছেন। নতুন করে অন্য কোন

দেশে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। এছাড়া তার কাছে বিদেশ যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত টাকাও নেই। তিনি এখন দেশেই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে চাচ্ছেন।

একদিন তিনি জানতে পারেন মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্রের কথা। আনোয়ারা বেগম অত্যন্ত আশাবাদী যে এ অঞ্চল থেকে কোন নারী শ্রমিক বিদেশ যেতে চাইলে এখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা পাবেন। যাতে করে বিদেশ গিয়ে তার মতো অন্য কাউকে প্রতারিত হতে না হয়। তিনি বিল্‌স এর তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্রের সফলতা কামনা করেন এবং তিনি পর্যাপ্ত সহায়তা ও দিতে প্রস্তুত।

বিল্‌স এর কাছে আনোয়ারা বেগমের প্রত্যাশা সেলাই কাজ শিখবেন এবং এখান থেকে তিনি একটি সেলাই মেশিন প্রত্যাশা করেন। এছাড়া তিনি গরু পালন প্রশিক্ষণ প্রহণের মাধ্যমে গরু পালন করে স্বাবলম্বী হতে চান।

কেস স্টাডি-০৪: অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যার্থতা ভুলতে চান বিদেশ ফেরত সোনিয়া

এক সন্তানের জননী মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার ছোট্ট বইনা গ্রামের সোনিয়া (৩৭)। স্বামী খোরশেদ মোল্লা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনিই একমাত্র সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি। স্বামীর একার উপার্জনে কোন রকমে চলে সোনিয়াদের সংসার। অভাবের সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে এবং একমাত্র সন্তানের ভব্যিষতের কথা চিন্তা করে বিদেশ যাওয়ার চিন্তা করেন সোনিয়া। এক আত্মীয়ের মাধ্যমে পরিচিত হন এক দালালের সাথে। এক লক্ষ টাকা খরচ করে কোন ধরণের প্রশিক্ষণ এবং সরকারী সনদও গ্রহণ করেন নি তিনি। বাংলাদেশ বিমানবন্ধর এবং বিদেশের বিমানবন্ধরে কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়াই গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে সৌদি আরব চলে যান তিনি। দূর সম্পর্কের ওই আত্মীয়ের মাধ্যমে একসময় পৌছে যান নতুন কর্মস্থলে। কিন্তু সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে বিদেশ গমন করে সেখানে থাকতে পারেন মাত্র এক বছর। নির্যাতিত হয়ে এক বছরের মাথায় ফেরত আসতে হয়েছে নিজ দেশে। যে ফ্যামিলিতে তিনি গৃহকর্মীর কাজ করতে গেছেন সেখানে সবাই তার সাথে ভালো আচরন করলেও ব্যাতিক্রম ছিলেন গৃহকর্তার ছেলে। খুব কম সময়ের মধ্যে তাকে নিয়মিত মানসিক নির্যাতন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এমনকি তিনি যৌন নির্যাতনরেও শিকার হন। তার ঠিক মত খাবার খেতে না দেওয়া, ঘুমাতে না দেওয়ার ঘটনা ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এবং নিজেকে রক্ষার জন্য নিজ দেশে ফিরে আসেন সোনিয়া। এক লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশ গিয়ে এক বছরে মাত্র দুই লক্ষ টাকা আয় করতে সক্ষম হন তিনি।

দেশে এসে এখন বেকার জীবন যাপন করছেন সোনিয়া। আবারও স্বপ্ন দেখেন বিদেশ যাওয়ার। কিন্তু বিদেশ যাওয়ার মতো কোন টাকা নেই তার কাছে। দেশে থেকেই তিনি এখন কৃষি কাজ এবং গরু পালন করতে চান। এরইমধ্যে তিনি জানতে পারেন মানিকগঞ্জের ঘিওরে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউ অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর অভিবাসী শ্রমিকদে জন্য তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্রের কথা। তিনি বিল্‌স এর এ ধরনের কার্যক্রমের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত খুশি হন। তার মতে বিল্‌স এর এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে অভিবাসী ইচ্ছুক নারী কর্মীরা তার মত আর প্রতারিত হবেন না। সব ধরনের তথ্য এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে পারবেন নারী শ্রমিকরা।

মানিকগঞ্জে বিল্‌স কার্যক্রম:

অভিবাসী বা অভিবাসী শ্রমজীবীরা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশীদার হলেও এরা সংগঠিত নন। ফলে আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার ও দরকষাকষি করার অধিকার সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতাও খুব কম। অন্যদিকে অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশে যাবার ব্যপারে দালালের সহযোগীতা নিয়ে অবৈধভাবে যাবার প্রবণতা এখনও কমছে না। অভিবাসী শ্রমিকরা বিশেষত নারী অভিবাসী শ্রমিকরা বিদেশে যে স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে তার বিপরীতে বিদেশ গিয়ে বিভিন্ন রকমের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হয়ে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে দেশে ফেরত আসছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানদন্ডের আলোকে সরকার আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এতকিছুর পরও নিশ্চিত হয়নি শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসী শ্রমিকদের শোভন কাজ (Decent work) এবং অভিসনের নামে অবৈধ মানব পাচার বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা। শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩ ও ২০১৮) এ অভিবাসী শ্রমিককে 'শ্রমিক' হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই।

নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের অধিকার বিষয়ে বিল্‌স জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৯ হতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রকল্পটি অভিবাসি শ্রমিক ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাসহ আরও ৪ টি উপজেলায় (শিবালয়, হরিরামপুর, ঘিওর ও সাটুরিয়া) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় একটি **'Training & Coordination Center'** এবং ঘিওর ও হরিরামপুর উপজেলায় ২ টি **'Migration information and Support Center'** স্থাপন করেছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি কার্যক্রম বিল্‌স এর প্রধান কার্যালয় থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অভিবাসী শ্রমিকদের সাম্প্রতিক তথ্য ও বিল্‌স পরিচালিত অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের কার্যক্রম ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরাসহ অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠিতকরণ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের বিশেষত নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

<u>সেবাসমূহ</u>

- অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন সমূহের কার্যক্রম ও সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান এবং সহযোগীতা করা
- বিদেশ গমনেচ্ছুক অভিবাসী শ্রমিকদের প্রাক-পরিকল্পনা এবং প্রাক বর্হিগমন প্রশিক্ষণ
- পাসপোর্ট ও ভিসা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান
- বিদেশ গমনেচ্ছু অভিবাসী শ্রমিকদের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা
- দলগত/একক কাউন্সিলিং অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে সেবা প্রদান
- বিদেশফেরত অভিবাসী শ্রমিকরা সফল উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।
- অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আইনী সহযোগীতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে আইনী সেবা ও সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে যোগসূত্র তৈরীতে সহযোগীতা করা
- অস্বচ্ছল অভিবাসী শ্রমিকদের (প্রকল্পের সুবিধাভোগী) ব্যবসায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান
- নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে শিক্ষণীয় উপকরণ বিতরণ

অভিবাসন প্রক্রিয়া হোক নিরাপদ:

এত কিছুর পরেও যারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখছে এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তারাই তো আমাদের সূর্যসন্তান, দেশ গড়ার অন্যতম কারিগর, এখন সময় এসেছে তাদের উন্নয়নে কিছু করার, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবার। দেশ থেকে যদি দক্ষ মানবসম্পদ বিদেশে পাঠানো যায় তাহলে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির পাশাপাশি তারাও হয়রানি ও অতিরিক্ত কাজের চাপ থেকে মুক্তি পাবে। দেশে মাত্র ৬০ থেকে ৭০টি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে যা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। দক্ষ মানবসম্পদ রপ্তানিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এখাতে বিনিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে প্রণোদনা দিতে হবে। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণ নিয়ে গেলে অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও বেতন পাবে এবং বিদেশের শ্রমবাজার আরো সমৃদ্ধ হবে, দেশ অর্জন করবে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা।

পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশী প্রবাসীদের সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করে বিদেশ গমন করতে হয়, আর এই বিদেশ গমন প্রক্রিয়ার ৯৪ শতাংশ কাজ হয়ে থাকে দালালের মাধ্যমে। তাই দালালের হাত ধরে প্রতারণার ঘটনাও কম নয়। কিন্তু এই দালালদের বাদ দিয়ে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পাদন বেশ কষ্টসাধ্য, কিন্তু এই দালালদের অভিবাসী সহযোগী হিসেবে মনে করে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বা স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছ নজরদারির আওতায় আনলে অভিবাসন প্রক্রিয়া নিরাপদ হবে। এতে করে দালালদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে সেই সঙ্গে প্রতারণার সুযোগ কম থাকবে।

সুপারিশ:

১. বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে স্থানীয় ভাষায় দক্ষ জনবল বাড়ানো। এতে করে বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকরা হয়রানির হাত থেকে সুরক্ষা পাবে।
২. বিদেশে দূতাবাসগুলোতে আইন শাখা স্থাপন করা যাতে প্রবাসীরা আইনী সহায়তা পায়।
৩. অবৈধ হয়ে পড়া শ্রমিকদের বৈধতার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের আলোচনা করা।
৪. অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে হবে।
৫. অবৈধ অভিবাসনের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. ভিসা-বাণিজ্যসহ নানা দুর্নীতি বন্ধে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৭. স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে দূতাবাসে বিশেষ দল তৈরি করতে পারে সরকার; যারা প্রতিটি মৃত্যু নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে কাজ করবে। ঘটনাস্থল, হাসপাতালে যাবে, যাচাই করবে। সংশ্লিষ্ট দেশের দায়িত্বশীলদের তদন্তে কোনো গাফিলতি দেখলে ওই দেশটির সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে হবে।
৮. নতুন বাজারে দক্ষ নারী শ্রমিক পাঠানোর বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।
৯. শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী সকল প্রকার সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি মেনে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
১০. নারী অভিবাসী শ্রমিকদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
১১. প্রবাসে কর্মরত নারী শ্রমিকদের নিয়োগকর্তার নাম, কর্মস্থলের ঠিকানাসহ নারী শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার তথ্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও অভিবাসী শ্রমিকের পরিবারকে তথ্য দিতে হেল্প ডেস্ক চালু করতে হবে।

১২. প্রলোভন দেখানো রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স বাতিলসহ তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. অভিবাসী শ্রমিকদের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. অসাধু চক্রের লালসা থেকে অভিবাসন প্রক্রিয়া নিরাপদ করা।

১৫. নির্যাতিত হয়ে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়ে অভিযুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সিকে চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া।

১৬. দৃষ্টান্ত সৃষ্টির জন্য দূতাবাস নির্যাতিত দু-একজনের পক্ষে আইনি লড়াই করার উদ্যোগ নিতে পারে। এতে নির্যাতিত কর্মীরা সুবিচার পাওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন।

১৭. প্রতারণা বন্ধে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৮. বিদেশের কর্মপরিবেশ উন্নত করার জন্য দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় আলোচনার জোরদার করতে হবে।

১৯. সংখ্যাগত বৃদ্ধি নয়, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে জোর দেওয়া।

২০. পুরনো শ্রমবাজারের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে এবং নতুন বাজার তৈরির চেষ্টা করা।

২১. শ্রম কূটনীতি শুরু করা।

২২. ঠিক কতজন বাংলাদেশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছেন। আর প্রতি বছর কতজন শ্রমিক ফেরত আসছেন এবং নতুন করে কতজন কাজে যাচ্ছেন, এর সঠিক পরিসংখ্যান তৈরি করা।

২৩. ইকামা থাকার পরও কেন অবৈধ ঘোষণা করা হচ্ছে, তা নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা।

২৪. প্রবাসী নারী শ্রমিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য কার্যকরী হট লাইন চালু করা।

২৫. দেশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আরো বাড়ানো এবং উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।